ভারতের সাম্যবাদ

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

মূল্য—বাঁধাই বারো আনা, সাধারণ আট আনা

খাদি প্রতিষ্ঠান—কলিকাতা
১৫, কলেজ স্কোয়ার হইতে
শ্রীহেমপ্রভা দাসগুপ্তা
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ—১৩৩৭, শ্রাবণ—১১০০
দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৩৮, ফাল্গুন—২০০০

প্রিণ্টার—শ্রীচারুভূষণ চৌধুরী
খাদি-প্রতিষ্ঠান প্রেস
সোদপুর, ২৪ পরগণা।

ভূমিকা

'ভারতের সাম্যবাদের' প্রবন্ধগুলি প্রায় সমস্তই 'রাষ্ট্রবাণী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের পক্ষে আজ যে শান্ত, সংযত, ত্যাগ ও নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত মনোভাবের একান্ত প্রয়োজন, প্রবন্ধগুলি তাহার সহায়ক হইতে পারে—এই আশায় এ-গুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা হইল।

শ্রীহেমপ্রভা দাসগুপ্তা

সূচীপত্র

—:*:—

ভারতের সাম্যবাদ

সামাজিক সাম্য আনয়নের জন্য ভারতব্যাপী নানা চেষ্টা চলিতেছে। সমাজ যে প্রাণবন্ত হইতেছে ইহা দ্বারা অন্ততঃ এটুকু স্পষ্ট হয়। ব্যথা অনুভব করিলে ও তাহা দূর করার চেষ্টা করিলে কালক্রমে তাহা দূর হইবে—এ প্রকার আশাও করা যায়।

সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য কেহ কেহ হিন্দু-সমাজ হইতে ব্রাহ্মণ বৈশ্যাদি বিভাগ দূর করিয়া দিবার প্রয়াসী; আবার কেহ কেহ বা ধনী নির্ধন ভেদ দূর করিয়া দিবার পক্ষপাতী। এই জন্য বাঙ্গালাতেও নানা সভা হইতেছে ও আলোচনা চলিতেছে। ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি বিভাগ দূর করিলেই যে সাম্য আসিবে এবং এই বিভাগ বশতঃই যে অসাম্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—এরূপ মনে করা ভুল।

বর্ণ বিভাগ স্বাভাবিক। ইহা মানুষের সহজাত। অর্থাৎ এই বিভাগ লইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে। ইহা সহজাত বলিয়াই সর্বদেশে ও সর্বকালে কার্য্য করিতেছে। অন্যান্য দেশে এই বিভাগ ক্রিয়াশীল হইলেও এই বিভাগ অজ্ঞাত ও প্রচ্ছন্ন। সে সব দেশে অন্য প্রকার বিভাগ, প্রধানতঃ ধনের বিভাগ দ্বারাই সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সেই হেতু সে সব সমাজ এক উপাদেয় ব্যবস্থা হইতেও বঞ্চিত। হিন্দু সমাজও আজ এই বিভাগের মূল কোথায় ও ইহার সার্থকতা কি তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। হিন্দুরাও অন্যান্য যে দেশে এই বিভাগ স্বীকৃত নহে সেই দেশবাসীরই ন্যায় আচরণ করিতেছেন; কেবল বিভাগের বাহ্যিক

কাঠামোটা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে মাত্র। সেই হেতু বর্ণ বিভাগ উত্তম হইলেও আধুনিক বিকার-বশতঃ সর্ব্বদাই ধিক্কারভাজন হইতেছে। কিন্তু বর্ণ বিভাগের বিকার যাহা আজ দেখিতেছি তাহা বিকার বলিয়াই জানা দরকার এবং এই বিকার দূর করিতে গিয়া যদি বিভাগই লোপ করিয়া দিই তবে কত বড় অকল্যাণ হইবে তাহাও বোঝা দরকার।

সামাজিক অসাম্য দূর করিবার জন্য বিভিন্ন দেশে "ইউটোপিয়া" বা আদর্শ-সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়া গিয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু তাহার একটীও কার্য্যকরী হয় নাই। যদি মনুষ্য সমাজে কার্য্যকরী কোনও সাম্য প্রতিষ্ঠার পথ থাকে তবে তাহা সংযমের উপর, বিশ্বজনীনতার উপর ও উদারতার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। ইহা সত্য যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ বিভাগে এই সার্ব্বজনীন শুভের পথ পাওয়া গিয়াছিল। ইহার অন্য কোনও পথ এতাবৎ জানা যায় নাই।

ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি বিভাগের মূল কি তাহা না জানায় এই বিভাগকে স্বার্থপর ব্রাহ্মণের আর্থিক উন্নতি ও সামাজিক সুখ ভোগের জন্য কল্পিত বলিয়া একটা সাধারণ অপবাদ দেওয়া হয়। বাস্তবিক পক্ষে ব্রাহ্মণ নিজ স্বার্থের জন্য বিভাগ করেন নাই। যদি সাংসারিক সুখ ভোগের কথা ধরা যায় তবে, এই বিভাগ অনুযায়ী ব্রাহ্মণের জন্য ভোগ সুখের কোঠায় শূন্য রাখা হইয়াছে। বর্ণ বিভাগ অনুযায়ী ব্রাহ্মণ অধ্যায়ন-অধ্যাপনা-পরায়ণ ও ভিক্ষাজীবি হইবেন।

চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ স্বাভাবিক বা সহজাত বলা হইয়াছে। ইহা কি ভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছিল সেই আদি কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসিদেকমেব, তদেকং সন্ন ব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়ো-রূপমত্যসৃজত ক্ষত্রম্।"—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ ছিল, তিনি একাকী কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি উত্তম শ্রেয়স্কর ক্ষত্রিয় জাতি সৃষ্টি করিলেন।

"স নৈব ব্যভবৎ, স বিশমসৃজত।" ক্ষত্রিয় সৃষ্টির পরও তিনি নিজের কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না, তজ্জন্য তিনি বিত্তোপার্জ্জনক্ষম বৈশ্য জাতি সৃষ্টি করিলেন।

"স নৈব ব্যভবৎ, স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণম্—ইয়ং বৈ পূষেয়ং হীদং সর্ব্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ।" ইহার পরেও তিনি কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইলেন না; তখন তিনি শূদ্রজাতি পূষণের সৃষ্টি করিলেন। এই পৃথিবীই পূষা নামে প্রসিদ্ধ। কারণ যাহা কিছু দেখা যায় এই পৃথিবীই তৎসমস্তকে পোষণ করিয়া থাকেন।

"স নৈব ব্যভবত্তচ্ছ্রেয়ো রূপমত্যসৃজত ধর্ম্মং, তদেতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং যদ্ধর্ম্মস্তস্মাদ্ধর্মাৎ পরং নাস্ত্যথো অবলীয়ান্ বলীয়াংসমাশংসতে ধর্ম্মেণ"—তিনি চারি বর্ণে সৃষ্টি করিয়াও কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইলেন না। সেই জন্য তিনি একটী কল্যাণকর উৎকৃষ্ট পদার্থ সৃষ্টি করিলেন—তাহা ধর্ম্ম। তাঁহার সৃষ্ট এই উৎকৃষ্ট পদার্থটি ক্ষত্রের ক্ষত্র (অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতিরও নিয়ন্তা); যাহা ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, অবলীয়ান অর্থাৎ অতিশয় দুর্ব্বল ব্যক্তিও বলীয়ানকে ধর্ম্মবলে আশংসা করে, অর্থাৎ জয় করিতে ইচ্ছা করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ব্রহ্ম স্বয়ংই সমাজ পরিচালনার জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র আকারে পরিণত এবং যাহাতে এই সমাজ

নিজ কার্য্য করিতে সমর্থ হয় তজ্জন্য ধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়াছে। বর্ণ বিভাগ ধর্ম্মাশ্রয়ী। এই বিভাগে ছোট বড় ভেদ দেখা যায় না। সমাজকে সামর্থ্যশালী করিবার জন্য যে কয়টী অঙ্গ প্রয়োজন কেবল সেই কয়টী অঙ্গই স্বীকৃত হইয়াছে। যে কোন সমাজেই এই কয়টি অঙ্গ বর্ত্তমান আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বলিতে কি বুঝায় তাহা এখানে স্পষ্ট হওয়া দরকার। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে দেখা যায়—

"শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ৪২
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ৪৩
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥" ৪৪

"শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, শাস্ত্রজ্ঞান, অনুভূতি এবং পরলোকে—বিশ্বাস এই সকল ব্রাহ্মণের স্বভাব-জাত কর্ম্ম। শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও নিয়মন-শক্তি—এইগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম। কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম। আর পরিচর্য্যা শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম।"

যে কেবলমাত্র জন্মিয়াছে সেও এই বিভাগের বশেই কোনও না কোনও বর্ণের কোঠাতেই জন্মিয়াছে। শিশু বড় হইয়া, মানুষ হইয়া যে গুণে গুণান্বিত হইবে সেই গুণ অনুযায়ী বিভাগ হইবে এমন নহে। এইখানে পূর্ব্বজন্ম ও পরলোকের কথা আসে। হিন্দুদিগের মধ্যে

পরলোকের অস্তিত্ব ও পুনর্জন্ম Axiomatic Truth—স্বতঃসিদ্ধ সত্য। ইহার প্রমাণের আবশ্যক নাই। মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষিরা ইহা জ্ঞানবলে জানাইয়াছিলেন এবং সহস্র সহস্র পুরুষ পরম্পরায় হিন্দুরা এই বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন যাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। কেবল গতানুগতিক ভাবে নহে, যিনিই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনিই প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারা ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছেন ও জানাইয়া গিয়াছেন। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ,—কোন প্রাণীই এই তিনটি গুণ হইতে মুক্ত নহে। যাহার ভিতর যে গুণের আধিক্য সেই গুণ তাহাকে অন্য হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ব্রাহ্মণের কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে। সেই গৃহে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তিনি সেই সকল গুণের সহিত জন্মিয়াছেন এবং সেই গুণ তাঁহার স্বাভাবিক বা সহজাত। সেই গুণোচিত যে কর্ম্ম তাহাই তাঁহার জীবিকার বৃত্তি। যিনি ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম লইয়াছেন তিনি প্রকৃতি কর্ত্তৃকই সেই গৃহে প্রেরিত হইয়াছেন। পুনঃ পুনঃ মানুষ জন্ম লইতেছে এবং প্রকৃতি কর্ম্ম-ফলানুযায়ী যে যে-গৃহের উপযুক্ত তাহাকে সেই গৃহেই জন্ম দিতেছেন। মানুষ বিশেষ গুণ লইয়া, অন্তর্নিহিত গুণের স্বাভাবিক প্রগতি বশতঃ বিশেষ গর্ভে, বিশেষ পিতার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, ইহাও পুনর্জন্মবাদের অপরিহার্য্য সিদ্ধান্ত।

কিন্তু এই গুণের বিভাগ মানুষের পথ কতটুকু বন্ধ করিতেছে?—কর্ম্ম বিভাগে মাত্র, অন্য কিছুতেই নহে। যে যে-গৃহে জন্মিয়াছে সেই গৃহের কর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক বলিয়া সে তাহাই গ্রহণ করিবে এবং তাহা করার স্বাভাবিক প্রকৃতির গতি বশতঃ অল্পায়াসেই সে তাহার

বৃত্তি পালন করিতে পারিবে। এখানে বৃত্তি অথবা কর্ম্ম খুব নির্দ্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কর্ম্ম এখানে জীবিকার কর্ম্ম মাত্র, অন্য কর্ম্ম নহে। যিনি নিজ কর্ম্ম-ফল বশতঃ, নিজের বিশেষ যোগ্যতা বশতঃ শূদ্রের গৃহে জন্ম লইয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে এইটুকু মাত্রই নিশ্চিত হইয়াছে যে, পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম তাঁহার স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক নিয়ম অবলম্বন করিয়া যদি তিনি চলেন তবে তাঁহার ও সমাজের শুভ। সেই স্বাভাবিক নিয়ম তাঁহাকে মাত্র এই টুকুই বাঁধিয়া দিয়াছে যে, জীবিকার জন্য তিনি পরিচর্য্যা-বৃত্তি গ্রহণ করিবেন। কিন্তু জগতের হিতের জন্য, জীবিকার উদ্দেশ্য-শূন্য হইয়া অন্য যে কোনও কর্ম্মে তাঁহার বাধা নাই। জীবিকার জন্য পরিচর্য্যাত্মক বৃত্তিই শূদ্র গ্রহণ করিবেন, যেহেতু বিশেষ যোগ্যতার জন্যই পরিচর্য্যা-পরায়ণের গৃহে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া জীবিত কালে ব্রাহ্মণের যাহা প্রাপ্য শূদ্রের পক্ষে কি তাহা অপ্রাপ্যই থাকিয়া যাইবে? না, মানুষের চরম প্রাপ্য যাহা, অর্থাৎ মোক্ষলাভ, পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার প্রাপ্তি, অথবা ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ—ইহা শূদ্র শূদ্রের জীবিকা গ্রহণ করিয়াও এবং সেই বৃত্তিতে নিবদ্ধ থাকিয়াও লাভ করিতে পারিবে।

গীতায় দেখিতে পাই, "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।" অর্থাৎ নিজ নিজ বর্ণানুযায়ী কর্ম্ম করিয়াই লোকে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে। মানুষ পশ্বাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একটী বিষয়ে। মানুষের ধর্ম্মবোধ আছে, পশ্বাদির এই ধর্ম্মবোধ নাই। পশুর মধ্যে মমতা, স্নেহ, দয়া, পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণ দেখা যায়; কাম, ক্রোধাদি নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি ত আছেই। এই সকলে মানুষের সহিত পশুর বৃত্তিগত পার্থক্য ধরা

যায় না। মাতৃস্নেহের কথা স্মরণ করিলে একটি গাভী তাহার সদ্যোজাত বৎসের জন্য যে প্রকার অস্থির-চিত্ত হয়, মানব-জননী তদপেক্ষা অধিক অস্থির হ'ন কিনা বলা যায় না। কিন্তু পশুর অধ্যাত্ম জ্ঞান নাই, মানুষের আছে। এই খানেই দুইটি জীবের পার্থক্য। মানুষের কাম্য সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত করিয়া ঊর্দ্ধে উঠা। সুখ-দুঃখ বোধ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানী ও দার্শনিক বিচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়াছেন যে, মানুষ যে সুখ চায় তাহার অন্তে গিয়া পঁহুছিলে, মানুষের কাম্য সুখের আকাঙ্ক্ষাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, বাস্তবিক সুখ হইতেছে দুঃখের অভাবে বা প্রসন্নতায় এবং তাহা আত্মজ্ঞান দ্বারাই প্রাপ্তব্য। নিষ্কাম কর্ম্ম হইতেই এই জ্ঞান আসে এবং জ্ঞানলাভের পরবর্ত্তী অবস্থায় সিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটে। নিজ নিজ বর্ণানুগত কর্ম্মের ভিতর দিয়াই এই সিদ্ধিলাভের পথ। এই পথ সকলকার জন্যই সমান খোলা এবং বর্ণ-বিভাগ দ্বারা এই পথের বিঘ্ন অপসারণ করা হইয়াছে।

জ্ঞান পাইতে হইলে তাহার জন্য নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে। নিজের দেহের জন্য যত কম কার্য্য করিতে হয়, নিস্বার্থ শ্রমের জন্য ততই অধিক সময় পাওয়া যায়। নিজ বর্ণে থাকিয়া কাজ করিলে এই জীবিকা অর্জ্জনের প্রচেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা সহজে আয়ত্ত হয় এবং নারায়ণ সেবার জন্য অবকাশ পাওয়া যায়। ছুতারের পুত্র পিতার কাজে বাল্যকাল হইতে সাহায্য করিতে করিতে সহজেই ছুতার হইয়া উঠে। ইহার জন্য তাহাকে টেক্‌নিক্যাল স্কুলে যাইতে হয় না, লেখাপড়া শিক্ষা করিতে হয় না। এই স্বাভাবিক উপায়ে জীবিকা অর্জ্জনের পথ বর্ণ-ধর্ম্ম

দেখাইয়া দিতেছে। কেবল তাহাই নহে, জীবিকা অর্জ্জনের পথ লোভ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শূন্যও করিয়া দিতেছে। যে ছুতার হইয়া জন্মিয়াছে সে ছুতারের কাজেই জীবিকার্জ্জন করিতে থাকিলে, নিজ ব্যবসায় বা সঙ্ঘে সে স্থান দৃঢ় করিয়া রাখিতে পারে এবং অপর কাহারও বৃত্তিতে তাহার হস্তক্ষেপ করিতে নাই বলিয়া লোভ প্রশমিত হয়। সামাজিক যত দুঃখ তাহার অনেকটা লোভ রিপু হইতে উৎপন্ন। ছুতারের লোভ হইতে পারে যে, কর্ম্মকারের কার্য্য অধিক লাভজনক। কিন্তু এই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সে কর্ম্মকারের বৃত্তি আরম্ভ করিয়া দিলে সে নিজেও নষ্ট পাইবে, অপরকেও নষ্ট করিবে।

কিন্তু যে যাহার পৈত্রিক ব্যবসা অবলম্বন করিয়া চলিলে, অর্থাৎ বর্ণগত বৃত্তির অনুসরণ করিলে, এই লোভ আর কার্য্য করিতে পারে না। বর্ণ-ধর্ম্মের সামাজিক প্রয়োগে তাই এক বর্ণের পক্ষে অন্য বর্ণের কার্য্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। নিজের বর্ণে থাকিয়া সহজ ও স্বাভাবিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেই বর্ণ-ধর্ম্ম নির্দ্দেশ দিতেছে এবং এইরূপে নিজে লোভ-মুক্ত থাকিয়া এবং অপরের লোভের পথও নিরুদ্ধ রাখিয়া তাহা প্রত্যেককেই শক্তি ও অধিকার অনুযায়ী সর্ব্বপ্রকার সমাজ-সেবার পথ দিতেছে। ছুতারের পুত্র পৈত্রিক ব্যবসা দ্বারা সহজে জীবিকা অর্জ্জন করিয়া উদ্বৃত্ত সকল সময়ই আত্মোন্নতি ও জন-সেবার জন্য দান করিতে পারে। তাহার গুণবান্ ভীষক বা ধীমান জ্যোতির্ব্বিদ বা বীর্য্যবান সৈন্য হইতে বাধা নাই। তাহার রুচি অনুযায়ী অপর যে কোনও বৃত্তির সে স্বেচ্ছাসেবক হইতে পারে

এবং সেই প্রকারে নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা আপনার জীবন ও জন্ম সার্থক করিতে পারে।

ইহা হইতে বোঝা যায় যে,—বর্ণ-ধর্ম্ম কেমন করিয়া, মানুষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোভের উর্দ্ধে উঠাইয়া দশের এক বলিয়া নিজকে অনুভব করিবার পথ দিতেছে। যেখানেই সাম্যের চেষ্টা হইবে সেইখানেই লোভ পরিত্যাগ করিতে হইবে। স্বার্থ-বুদ্ধি যত বেশী হইবে ততই অসাম্য আসিবে। বর্ণ-ধর্ম্মাশ্রয়ী সমাজ ত্যাগ-বুদ্ধি জাঁগ্রত করার পথ গ্রহণ করিয়য়াছে।

আইন করিয়া সকলকে সমান ধনাধিকারী বা জ্ঞানাধিকারী করা যায় না। কিন্তু ত্যাগবৃত্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া যাহার অধিক সম্পদ আছে তাহার মনে তাহা দশের জন্য ব্যয়িত করার স্পৃহা জাগানো যায়। বর্ণ ধর্ম্মের পালনে স্বভাবতঃই এই ত্যাগ-বুদ্ধি বর্দ্ধিত হওয়ার পথ আছে। দ্বন্দ্ব আসে Struggle for existence এবং Survival of the fittest নীতিতে—জীবন সংগ্রামে অপরকে পরাজয়েচ্ছায় এবং মৎস্যনীতির পোষণে। Survival of the fittest মানে যোগ্যতমের জয়। ইহাই আমাদের শাস্ত্রে "মৎস্য নীতি" বলিয়া খ্যাত। ইহার মানে মৎস্যের মধ্যে যে বড় সে ছোটকে খাইয়া ফেলে, আবার তার চেয়ে যে বড় সে তাহাকে খাইয়া ফেলে। মানুষের ভিতর এই নীতি অসাম্য আনে, মানুষকে পশ্বাদির মতই নীচ বৃত্তির বশীভূত করে। বর্ণ-ধর্ম্ম সকলকে বাঁচিতে ও বাঁচাইতে শিক্ষা দিয়া মানুষকে দেবত্বাভিমুখী করে। ইহা লোভ বৃত্তিটাই দমাইয়া ত্যাগ-বৃত্তিকে পুষ্ট করে।

আইন করিয়া এবং বলপূর্ব্বক এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার চেষ্টা বলশেভিকবাদীরা করেন। কিন্তু যদি মনের পরিবর্ত্তন না হয় তবে আইন দ্বারা অধিকাংশ লোককে ত দীর্ঘ দিন সৎ রাখা যায় না। মানুষের আইনের দুর্ব্বলতা এইখানে। আইন মানিবার স্পৃহা না জাগিলে সে আইন কার্য্যকরী হয় না। কিন্তু বিশ্ব-নিয়মের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্বও এইখানে। মানুষকে নির্লোভ ও পরস্পরের প্রতি দরদী করিবার জন্য বিশ্ব-নিয়মের আশ্রয় লইলে, সহজাত বৃত্তিতে নিজের জীবিকা-প্রচেষ্টা আবদ্ধ রাখিলে সমাজে স্থায়ী সুখ ও সাম্য আসিতে পারে। বর্ণ-ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত মহান সাম্যবাদ ঢাকা পড়িয়া কতকগুলি বিকারই আজ বর্ণ-ধর্ম্ম বলিতে চোখে পড়ে। বর্ণ-ধর্ম্মের নামের আশ্রয়ে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান ও শূদ্রের হীনতা-বোধ অত্যন্ত পীড়াদায়ক। কিন্তু এইখানেই ত গ্লানি। আমরা 'বৃহদারণ্যকে'র বাক্যে দেখিয়াছি যে, সমাজ-দেবতার হৃদয় হইতে চারিবর্ণের উদ্ভব। প্রয়োজনের অনুরোধেই ইহাদের সৃষ্টি—ছোট বড় করিয়া মানুষে মানুষে অসাম্য সাধন করিবার জন্য নহে। বর্ণ-ধর্ম্মাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ নিজকে শূদ্র অপেক্ষা এতটুকুও শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারেন না। তাঁহার দায়িত্ব শ্রেষ্ঠ এবং— সেই দায়িত্ববোধেই তাঁহার 'তৃণাদপি সুনীচ' হইয়া থাকিবার কথা। ইহার ব্যতিক্রমে তিনি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইবেন। বর্ণ-ধর্ম্ম সাম্যের ধর্ম্ম—তাহার বিকারেই অসাম্য ফুটিয়া উঠে। বর্ণ-ধর্ম্ম সকলকেই সেবা করিবার দরজা পুরা খুলিয়া দিয়াছে এবং আত্মোন্নতি করিবার পথ সকলের জন্য পরম সমাদরে উন্মুক্ত রাখিয়াছে।

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"

নিজের বর্ণে থাকিয়া জীবিকার্জ্জন অসচ্ছল হইলে মৃত্যু-বরণও ভাল, তথাপি পরের বর্ণ-ধর্ম্ম বা বৃত্তি জীবিকার্থে গ্রহণ করিতে নাই—এই অনুশাসন সমাজের পক্ষে সাম্যের পথ হইতে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা দূরে রাখিয়াছিল।

বর্ণ-ধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে কতকগুলি রূপক প্রচলিত আছে। মনুর অনুশাসনে ও মহাভারতে তাহা দেখা যায়। তাহার মধ্যে কতকগুলি সাম্যভাব হইতে প্রসূত বলিয়া অর্থ করা যায়, আবার কতকগুলির সে অর্থ করা যায় না। শাস্ত্রের মধ্যে নানা লোকের হাতের ছাপ আছে। নোংরা ছাপও অনেক আছে। বর্ণ-ধর্ম্ম বলিতে শাশ্বত ধর্ম্মাশ্রয়ী যে বিধি তাহাই সত্য বলিয়া জানিয়া রাখিলে, উহার বিকৃতিরও সন্ধান পাওয়া যায় ও বিকৃতি দূর করিবার পথও পাওয়া যায়।

'জন্মগত বিভাগের বিরুদ্ধে এই আপত্তি করা হয় যে, বিভাগ জন্মগত বলিয়াই নিজ বর্ণোপযোগী গুণ যদি কোনও মানুষের ভিতর দেখা না-ও দেয় তবুও সে কেবল জন্মবশতঃই সেই বর্ণে থাকিয়া যায়। কাজেই সে ব্যক্তির পক্ষে সেই বর্ণে থাকায় অসত্যাচরণ করা হয় এবং সমাজে বর্ণ বিভাগও নিরর্থক হইয়া যায়। এতদুত্তরে ইহা কল্পনা করা কঠিন নহে যে, জাগ্রত সমাজ সহজেই ইহার প্রতিকার করিতে সমর্থ। বস্তুতঃ সেই প্রতিকারের অস্ত্র সমাজের হাতেই ছিল, এবং তাহা ব্যবহৃতও হইত। আজিকার অসাম্যপূর্ণ সমাজে কেহ চৌর্য্যাদি পরায়ণ হইলে সমাজই যেমন তাহার প্রতিকার করার শক্তি ব্যবহার করিয়া সমাজকে

শুদ্ধ ও পবিত্র রাখে, তেমনি তখনকার সমাজে বর্ণ-বিভাগ-ভঙ্গকারী থাকা সত্ত্বেও বর্ণ বিভাগ শুদ্ধ রাখা সম্ভব ছিল ও শুদ্ধ রাখা হইত।

অবশ্য এই স্বাভাবিক ভাগ অনুযায়ী সমাজ আজ আর বিভক্ত নাই। ব্রাহ্মণ আজ যে কোনও বর্ণের বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন। অন্য তিন বর্ণও আজ বৃত্তির বাঁধ ঠিক রাখে নাই। সামাজিক ব্যবহারে শিথিলতা সামাজিক নিয়মেই নিবারিত হওয়ার কথা। কিন্তু মুসলমান আক্রমণের পর হইতেই ভারতবর্ষে স্বভাব অনুযায়ী বর্ণ বিভাগে আঘাত পড়িয়াছে। এই আঘাত এখনও পূরা মাত্রায় চলিতেছে।

শতবর্ষ পূর্ব্বে ইংরাজী মোহে মুগ্ধ বাঙ্গালী যুবকেরা যাঁহারা পরবর্ত্তী কালে প্রতিভা দ্বারা বাংলা আলোকিত করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বামুন পণ্ডিত দেখিলে তাঁহাকে মর্ম্মাহত করিবার জন্য চেঁচাইতেন—"আমরা গোরু খাই গো—আমরা গোরু খাই"। এই "গোরু খাওয়া" বাক্য দ্বারা সমাজকে মিথ্যা ও জঘন্য ভাবে আঘাত করা হইত। সে আঘাত করিবার সময় বাঙ্গালী মেধাবী যুবকগণের একথা মনে উদয় হয় নাই যে, কেন গো-হত্যার বিরুদ্ধে সংস্কার হিন্দু-সমাজে এমন সুদৃঢ় ভাবে বদ্ধমূল রহিয়াছে? আর্য্যেরা যে গো-মাংস আহার করিতেন তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। অতিথিকে প্রীতি ভোজন করাইবার জন্য গো-হত্যা করা হইত বলিয়া অতিথির অন্য নাম 'গোঘ্ন'। কিন্তু একথা তদানীন্তন যুবকদের মনে হয় নাই যে,' কেন হিন্দুজাতি যাহারা এক কালে গো-হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইত না, আজ তাহারা গো-হত্যার নামে শিহরিয়া উঠে? এই সহজ কথাটি তাঁহারা ভুলিয়া-ছিলেন—ইংরাজের অনুকরণের মোহে পড়িয়া ভুলিয়াছিলেন যে, হিন্দু-

সমাজ Progressive, ক্রমোন্নতিশীল। কোথাও এই সমাজে দাঁড়ি টানা ছিল না যে, উন্নতি এই পর্য্যন্ত। সদ্‌বুদ্ধিতে ও বিচারে যাহা ভাল বুঝিত তাহাই হিন্দু-সমাজ গ্রহণ করিতে সক্ষম ছিল; ভ্রান্ত পূর্ব্বানুবর্ত্তিতার আবর্জ্জনা তাঁহাদের গতিরোধ করিয়া রাখিত না। তাঁহারা যখন দেখিতে পাইলেন যে, গো-হত্যা করা ভারতীয়ের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে অমঙ্গলজনক তখনই তাঁহারা গো-হত্যা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

যেমন গো-হত্যা করা ও গো-হত্যা না করার ভিতরের ঐতিহাসিক সত্য উপলব্ধি না করিয়াই রব তোলা হইয়াছিল—গো-মাংস খাওয়াতে হিন্দুর হানি নাই, তেমনি অনুরূপ অজ্ঞতা-বশতঃই আজ আবার বর্ণ-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে-অজ্ঞতা এত ঘন যে, অনেকেই তাহার ভিতর দিয়া বর্ণ-ধর্ম্মের যৌক্তিকতা দেখিতে পা'ন না। যেমন সাহেবেরা গরু খায়—কাজেই সে কাজটা না করা কুসংস্কার বলিয়া এক সময়ে অনেকের ধারণা হইয়াছিল, তেমনি সাহেবেরা বর্ণ-ধর্ম্ম জানে না ও মানে না, সেই হেতু বর্ণ-ধর্ম্মটাই খারাপ—এইরূপ একটা ধারণা আমাদের অনেকের মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। হিন্দু আজ প্রশ্ন করিতে চাহে না যে, এত বড় পুরাতন ও মহান্ সভ্যতা অবিচ্ছিন্নভাবে শত আক্রমণের বিরুদ্ধে কি করিয়া টিকিয়া আছে? হিন্দুজাতি আজও কেন হিন্দু আছে? কেন আজও সে হাজার হাজার বৎসরের আচার-আচরণ লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিয়াছে? কেনই বা অন্য সব জাতি কালের পরিবর্ত্তনের সহিত বিলুপ্ত হইয়াছে অথবা সভ্যতার ধারা পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে? হিন্দুর স্থায়িত্বের মূল কোথায়? কোথায় তাহার বজ্রশক্তি? প্রশ্ন করিতে চায় না—

তাই বুঝিতেও পারে না যে, কোনও এমন একটা সত্য বস্তু হিন্দু-সমাজ নিশ্চয়ই অবলম্বন করিয়া আছে যাহার কাছে কালের আঘাত পৌঁছে না। সত্য পুরাতন হয় না, সত্য শাশ্বত। হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থায় সেই শাশ্বত সত্য যে পরিমাণে সার্থক হইয়াছে সেই পরিমাণে হিন্দু সাফল্য লাভ করিয়াছে। এ প্রশ্নের সমাধানে সামাজিক ব্যবস্থায় বর্ণ-ধর্ম্মের বিশেষত্বই সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়ে। বর্ণ-ধর্ম্মকে বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়া আছে বলিয়াই হিন্দুরা এই পরম সত্যকে লাভ করিয়াছে এবং সত্যকে লাভ করিয়াছে বলিয়াই কালের প্রভাবকেও তাহারা এড়াইয়া চলিয়াছে।

কিন্তু এই বর্ণ-ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজে আজ বিকৃতভাবে প্রযুক্ত হইতেছে। আজ যাঁহাকে যে বর্ণ বলা হয় তিনি সে বর্ণের ধর্ম্ম আচরণ করেন না; যে গুণ থাকিলে তাহার নাম সূচক বর্ণে তিনি থাকিতে পারিতেন অনেকেরই সে গুণ নাই। কাজেই গুণ-কর্ম্ম-বিভাগ আজ-কালকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে সত্য নহে। কিন্তু গুণানুযায়ী ব্রাহ্মণ যে আজ একেবারে নাই এমনও নহে। হয়ত সে ব্রাহ্মণের উপাধি চক্রবর্ত্তী বা বন্দ্যোপাধ্যায় নহে, হয়ত পদবীতে তিনি বৈশ্য।

বর্ণ-ধর্ম্ম একবার সমাজে প্রচলিত হওয়ার পর আবার তাহার বিকৃতি কেন হইয়াছে তাহার হেতু সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে। এ সন্দেহও হয় যে, নিশ্চয়ই ইহার ভিতর গলদ ছিল যে জন্য ইহা বিকৃত হইতে পারিয়াছে। গলদ আছে সত্য, কিন্তু তাহা নিয়মের ভিতরে নহে—মানুষের মনের ভিতরে। হিন্দু সমাজে বর্ণ-ধর্ম্মের প্রয়োগ যেমন বহু পুরাতন, ইহার বিকৃতিও তেমনি বহু পুরাতন। গীতাতেই ইহার সুস্পষ্ট উল্লেখ পাই।

তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণ-ধর্ম্মাশ্রিত কর্ম্মযোগের উপদেশ দিয়াই চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবান বলিতেছেন :—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ !
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥

"এই কর্ম্মযোগ মার্গ আমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম। তিনি নিজ পুত্র মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। এই প্রকার পরম্পরা সূত্রে প্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ জানেন। কিন্তু কালক্রমে এই যোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তুমি আমার ভক্ত ও সখা; এইজন্য এই উত্তম রহস্য স্বরূপ পুরাতন যোগ তোমাকে বলিলাম।"

ভগবানের এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে জ্ঞান নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু কর্ম্মযোগ বর্ণ-ধর্ম্মাবলম্বী। কাজেই যোগের কথাতে বর্ণ-ধর্ম্মের কথাই বলা হইতেছে। অর্জ্জুনকে ভগবান উপদেশ দিয়া নষ্ট বর্ণ-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করেন। কিন্তু এই ধর্ম্মানুসরণও চিরস্থায়ী হয় নাই।

পরবর্ত্তীকালে ভগবান বুদ্ধ দেখিতে পান, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন তাঁহারা ভোগপরায়ণ ও স্বার্থান্বেষী। তিনি আরও দেখিলেন, বর্ণ-ধর্ম্মের মর্য্যাদা ব্রাহ্মণেরা নানা ভাবেই রক্ষা করিতেছেন না, পরন্তু কূট তর্কে দিনাতিপাত করিতেছেন।

তিনি এই ধর্ম্মের সংস্কার মানসে নূতন সন্ন্যাসী দল সৃষ্টি করিলেন। বর্ণ-ধর্ম্মের উপর অস্ত্রোপচার করায় তাহার গ্লানি অনেক দূরীভূত হইয়াছিল। কিন্তু কালে আবার বিকৃতি ঘটায়, বৌদ্ধধর্ম্মের নামে নানা অনাচারে হিন্দুস্থান পূর্ণ হয়। তখন শঙ্করাচার্য্যদেব বর্ণ-ধর্ম্মের বিকার দূর করার জন্য আবার এক আদর্শ সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। ইহাও স্থায়ী হয় নাই। বর্ণ-ধর্ম্ম সমাজে রাজাকে আশ্রয় করিয়াছিল। মুসলমান অধিকার কালে এই আশ্রয় নষ্ট হওয়ায় বর্ণ-ধর্ম্মের মধ্যে গ্লানি প্রবিষ্ট ও বর্দ্ধিত হইবার পথ পায়। তারপর ইংরাজেরা রাজা হইয়া তাহাদের পরিপূর্ণ মাদকতাময় ভোগবৃত্তিসহ ব্রাহ্মণের স্থান গ্রহণ করায় বর্ণ-ধর্ম্মের আচারণের নিকৃষ্টতম যুগ উপস্থিত হইয়াছে।

হিন্দুর সামাজিক সাম্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বর্ণ-ধর্ম্মের অপপ্রয়োগ দূর করিয়া সকল ব্যবহারিক গ্লানি হইতে তাহাকে মুক্ত করা দরকার। এজন্য সর্ব্ব প্রথমেই অস্পৃশ্যতারূপ প্রধানতম অসাম্য যাহা বর্ণ-ধর্ম্মের দ্বারা কখনও সমর্থিত হয় নাই ও হইতে পারে না তাহা দূর করা চাই। অস্পৃশ্যতা নাশ করার উপায় নানা ভাবেই আলোচিত হইয়াছে এবং অল্প-বিস্তর কার্য্যও হইতেছে। বর্ণ ধর্ম্মের প্রয়োগের আর একটি বৃহৎ গ্লানি হইতেছে বর্ণোচিত জীবিকা পরিত্যাগ ও বর্ণোচিত গুণত্যাগ। যাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমত্তা ও অধিক দায়িত্ব-বোধ বশতঃ অধিকার বেশী ছিল, সেই ব্রাহ্মণেরাই আজ বেশী অপরাধী। বৈশ্য ও শূদ্রেরা তত পরিমাণে বৃত্তি ত্যাগ করেন নাই যত ব্রাহ্মণেরা করিয়াছেন।

ইহার সংস্কার করিতে হইলে আবার একদল নিষ্কাম-কর্ম্মী গৃহীর অর্থাৎ গৃহী-সন্ন্যসীর প্রয়োজন যাঁহারা স্বেচ্ছায় শূদ্রত্ব গ্রহণ করিবেন; যাঁহারা

অবজ্ঞাত পরিচর্য্যাত্মক কার্য্যকে মর্য্যাদা দিয়া সকল শূদ্রকে মর্য্যাদা দিবেন এবং অধ্যাত্ম বিদ্যায় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া ব্রাহ্মণকেও স্বীয় বৃত্তি গ্রহণে প্ররোচিত করিবেন।

যুগে যুগে এই সংস্কারের ভিতর দিয়া হিন্দুরা বাঁচিয়া আসিয়াছে ; আজও বাঁচিবে। নিজ নিজ বর্ণানুযায়ী গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের আবির্ভাবে যে সামাজিক সাম্য উপস্থিত হইবে তাহাতে বসুন্ধরা সুখে পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

সকল দেশের সাম্য প্রচেষ্টা অপেক্ষা হিন্দুর স্বীকৃত সাম্য ব্যবস্থা যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে তাহা ধ্বংস না করিয়া, সংস্কৃত করিবার চেষ্টা করাই সমাজের ও মানবের হিতকামী প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

বর্ণ-ধর্ম্ম

বর্ত্তমানে বর্ণ-ধর্ম্ম বলিতে সাধারণতঃ বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারিটি কোঠায় কতকগুলি স্বার্থপর লোক সমাজকে বিভক্ত করিয়া বজ্র বাঁধনে বাঁধিয়া ব্রাহ্মণের পায়ের তলায় ফেলিয়া দিয়াছে, মূলে ব্রাহ্মণের চাল-কলার লোভ। আর সেই লোভ ভাল করিয়া সিদ্ধ করিবার জন্য মনুর অনুশাসন আছে যে, শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে গালি দেয় তবে তাহার জিহ্বা কাটিতে হইবে, যে অঙ্গ দ্বারা অপমান করিবে সেই অঙ্গ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এমন কি, শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের নিন্দা শোনে তবে কানে তপ্ত সীসা ঢালিয়া দিতে হইবে। এমনি বর্ব্বরতা ও নিষ্ঠুরতার গণ্ডী দ্বারা ব্রাহ্মণ অপর জাতিগুলির উপর নিজ প্রাধান্য বজায় রাখিয়াছে। আর এই বর্ণ-ধর্ম্মের ধ্বজাধারী ব্রাহ্মণেরাই ভারতের কোটি কোটি হিন্দুকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়া পশুর অধম ব্যবহার করিতেছে।

কিন্তু ইহা বর্ণ-ধর্ম্মের স্বরূপ নহে। বর্ণ-ধর্ম্ম বলিতে, সমাজ পরিচালনার জন্য মানুষের সমাজ সেবার কার্য্য, বৃত্তি অনুযায়ী যে চারিটি বড় ভাগে ভাগ করা হইয়াছে তাহাই বোঝায়। বর্ণ-ধর্ম্ম এই চারিটি ভাগ স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ব্রাহ্মণের বৃত্তি জ্ঞান দান করা এবং ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি শাসন ও পালন করা। বৈশ্যের বৃত্তি বাণিজ্য করা। শূদ্রের বৃত্তি পরিচর্য্যা করা। এই সকল বৃত্তি সহজাত অর্থাৎ পিতা হইতে পুত্র প্রাপ্ত হয়। কেবল এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমাজ-সেবক (মানুষ মাত্রেই সমাজ-সেবক) জীবিকার্জ্জন

করিতে পারিবে—ইহার অন্যথা করিতে পারিবে না। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে ভিক্ষান্ন দ্বারাই জীবিকার্জ্জন করিতে হইবে,—অপর কেহ জীবিকা স্বরূপ ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিবে না, ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিবে না। ক্ষত্রিয়কেও রক্ষণ কার্য্য দ্বারাই জীবিকার্জ্জন করিতে হইবে, অন্য কোনও বৃত্তি দ্বারা সে জীবিকার্জ্জন করিতে পারিবে না। এই বৃত্তির গণ্ডী জীবিকার্জ্জন পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ। জীবিকার জন্য না হইলে যে কোনও বৃত্তি যে কেহ গ্রহণ করিতে পারিবে। যেমন কর্ম্মকার জীবিকার জন্য কর্ম্মকারের কার্য্য করিয়া বাকী সময় যদি বাণিজ্য কর্ম্ম করে, অথবা সাধারণের হিতের জন্য কোনও দোকানের অবৈতনিক অধ্যক্ষ হয়, তবে তাহা বর্ণ-ধর্ম্মে বাধে না। সে বাণিজ্যকে তাহার জীবিকার উপায় না করিলেই হইল। তেমনি বর্ণ-ধর্ম্মানুসারে শূদ্রকে পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম দ্বারাই জীবিকার্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু জীবিকার জন্য পরিচর্য্যা করিয়া শুদ্ধ সেবার জন্য বৈশ্য-ক্ষত্রিয়ের বিশেষ কর্ম্মও বর্ণ-ধর্ম্মানুযায়ী সে করিতে পারে। ইহা বোঝা অত্যন্ত সোজা যে, উপার্জ্জনের জন্য যে কর্ম্ম করা হয় না, সেই কর্ম্মই দান পর্য্যায়ভুক্ত। বর্ণ-ধর্ম্ম দান প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত বা রোধ করিতে বলে না।

যজ্ঞদান তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিনাম্।

এই প্রকার বর্ণ-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা আজকাল নূতন। গান্ধীজী বর্ণ-ধর্ম্মের এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এবং তিনি শাস্ত্র হইতেই ইহার প্রমাণ পাইয়াছেন। বিশেষ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, ইহাই গীতার কথিত বর্ণ-ধর্ম্ম। গীতাকার অত্যন্ত প্রবল ও প্রাঞ্জল ভাবে নির্দ্দেশ

করিয়াছেন যে, সমাজকে সুস্থ ও ঈশ্বরাভিমুখী করিবার উপায় হইতেছে, প্রত্যেক গৃহস্থের কর্ম্মযোগ গ্রহণ করা অর্থাৎ ঈশ্বরোদ্দেশ্যে কর্ম্ম করা। বর্ণ-ধর্ম্ম যাহা উপরে ব্যাখ্যাত হইল সেই প্রকার বর্ণ-ধর্ম্ম পালন দ্বারাই মানুষ কর্ম্ম-যোগী হইয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে।

বর্ণ-ধর্ম্মের এই ব্যাখ্যাই যে শাস্ত্রোক্ত সে সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র নাই। বর্ণ-ধর্ম্মের এই ব্যাখ্যার সত্যতা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া বিষয়ান্তরে প্রবেশ করিব। শাস্ত্র প্রমাণ বলিতে গেলেই কোনও এক বা একাধিক শাস্ত্রকে মান্য করিয়া লইতে হইবে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মানুযায়ী গীতাকে আমি প্রামাণ্য শাস্ত্র মনে করি। এই গীতাকে সর্ব্ব উপনিষদের সার বলিয়া হিন্দুরা মানিয়া লইয়াছেন এবং আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক হিন্দুই গীতার সম্মান করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া গীতা এমন একখানি গ্রন্থ যাহার কোনও একটি নির্দ্দেশ কাহারও মনুষ্যত্বের বিরোধী নহে। যে কেনেও ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি গীতার নৈতিক নির্দ্দেশ সকল অসঙ্কোচে মানিয়া লইতে পারেন।

গীতায় বর্ণ ধর্ম্মবাদ

গীতার প্রথম অধ্যায় মুখবন্ধ ও দ্বিতীয় অধ্যায় বিষয় অবতারণা। গীতার তৃতীয় অধ্যায়খানাই গ্রন্থের চাবিস্বরূপ। তৃতীয় অধ্যায়ে সমস্ত কর্ম্ম-যোগ শাস্ত্রের মূল যুক্তিগুলি বর্ণিত হইয়াছে। ৪ হইতে ১৭ অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায়ের ভাষ্য মাত্র। অষ্টাদশ অধ্যায় সার কথাগুলির পুনরাবৃত্তি। সাম্যবাদী সমাজ গঠিত হওয়ার জন্য প্রথমেই চাই, সকলকে কর্ম্ম করিতে হইবে—এই সূত্র স্বীকার করিয়া লওয়া। বিনাশ্রমে

কাহারও অন্নে অধিকার নাই—গীতা এই কথাই প্রথমে বলিয়া লইয়াছেন। এই প্রমাণ তৃতীয় অধ্যায়ের ৯, ১০, ১৩, শ্লোকে আছে। নিঃস্বার্থ কর্ম্ম অর্থাৎ সেবার্থে কৃত কর্ম্মই যজ্ঞ। সেই যজ্ঞ-কর্ম্মের সঙ্গেই ঈশ্বর প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষকে বৃদ্ধির জন্য, উন্নতির জন্য, যজ্ঞ-কর্ম্ম করিয়া যাইতেই হইবে। যদি কেহ কর্ম্ম না করিয়া আহার করে তবে সে চোর।

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়াং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।"
"সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেস বোঽস্ত্বিষ্ট কামধুক্।"
"যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তোমূচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।"

এই কর্ম্মের দায় হইতে কাহারও রেহাই নাই। যিনি জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহাকেও কর্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে। আসক্ত ব্যক্তিরা স্বার্থ পরবশ হইয়া যেমন নিষ্ঠার সহিত কর্ম্ম করিয়া থাকে, অনাসক্ত ব্যক্তি তেমনি নিষ্ঠার সহিত অনাসক্ত হইয়া লোক-সেবার জন্য কর্ম্ম করিয়া যাইবেন।

"সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাঽসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোক সংগ্রহম্।"

অনাসক্ত হইয়া কার্য্য করিবার পথ হইতেছে নিজেকে অকর্ত্তা জ্ঞান করা। প্রাকৃতিক গুণ বশতঃই সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে, অহঙ্কার-বিমূঢ় আত্মাই নিজেকে কর্ত্তা মনে করে। কিন্তু যিনি গুণ-কর্ম্ম-বিভাগের তত্ত্ব

বুঝেন, তিনি গুণ সকল গুণে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল বিষয়াদিতে প্রবৃত্ত হইতেছে জানিয়া আসক্ত হন না।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণ কর্ম্ম বিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে।"

কিন্তু সকলে এই রকমে বোঝে না এবং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগের অন্তরালে যে মহৎ অভিপ্রায় রহিয়াছে তাহার পরিচয় পায় না। তাহারা অজ্ঞান। তাহাও এই প্রকৃতি-জাত গুণবশতঃই হইয়া থাকে। জ্ঞানবান ব্যক্তিও নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্ম-চেষ্টা করিয়া থাকেন। প্রাণীগণ প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করে। কেবল ইন্দ্রিয় নিগ্রহে লাভ নাই।

"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।"

এই প্রকৃতি-গত গুণ অনুযায়ী কর্ম্ম করিয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিবার যে রাজপথ খোলা রহিয়াছে তাহার বিঘ্ন হইতেছে রাগ দ্বেষ ইত্যাদি রিপুগণ। এই সকলের বশীভূত হইতে নাই। ইহা জানিয়া রাখা দরকার যে, নিজের বর্ণগত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান যদি অসম্পূর্ণ ভাবে করা যায়, তাহাও অপরের বর্ণ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সুন্দররূপে অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা ভাল। নিজের বর্ণ-ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে যদি নিধন পাইতে হয়, নিজের বর্ণানুযায়ী জীবিকা যদি ভরণ-পোষণের পক্ষে যথেষ্ট না দিয়া মৃত্যু দেয়, তবে তাহাও ভাল। তবু পরের বর্ণ-ধর্ম্মে, পরের বর্ণোচিত জীবিকায় হস্তক্ষেপ করিবে না, কারণ পর-ধর্ম্ম ভয়াবহ। আপাততঃ ইহা জীবিকা

দিলেও সমস্ত সমাজকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও তজ্জাত অসাম্যরূপ মৃত্যুতে নিক্ষেপ করে।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্ম স্বভাব প্রভব গুণ অনুসারে প্রতিভাত। ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম, দান, দম, তপস্যা, শৌচ, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য। শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দাক্ষ্য, যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও প্রভুত্ব—এই সকল কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের স্বভাব-জাত। কৃষি, গো-রক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাব-জাত কর্ম্ম। পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম শূদ্রের স্বভাব-জাত। নিজ নিজ স্বভাব জাত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া লোক সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈর্গুণৈঃ॥
শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়ম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥
কৃষিগোরক্ষ্য বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥

স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া যে ভাবে সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাও বলিতেছি। যাহা হইতে প্রাণীগণের উদ্ভব, যাহা কর্ত্তৃক জগতের সমুদয় ব্যাপ্ত, নিজ বর্ণ-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম দ্বারা তাহারই অর্চ্চনা করিয়া মানুষ সিদ্ধি

প্রাপ্ত হয়। অপরের ধর্ম্ম ভাল করিয়া অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা স্বীয় বর্ণ-ধর্ম্ম খারাপ ভাবে অনুষ্ঠান করাও ভাল। কেন না স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম করিয়া পাপ হয় না। আর যে কর্ম্মের সহিত যিনি জন্ম লইয়াছেন সে কর্ম্ম দোষ-যুক্ত হইলেও তাহা ত্যাগ করিতে নাই। মানুষের কোন কাজই বা নির্দ্দোষ আছে? অগ্নিতে যেমন ধূম তেমনি সমস্ত কর্ম্মই দোষযুক্ত।

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্ব কর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বন্দতি মানবঃ॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥

পাঠক বলিতে পারেন যে, এ কথা বোঝা গেল—বংশ-পরম্পরায় ব্রাহ্মণাদি চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া জীবিকার্জ্জন করার পথ অবলম্বন করার নির্দ্দেশ গীতায় রহিয়াছে। গীতায় এই প্রকার বর্ণ-ধর্ম্ম স্বীকৃত হইয়াছে মানিলেও গুণ যে বংশ-পরম্পরা অনুযায়ী হইবে—এ কথা মানি না। এখানেও বাস্তবিক গোল নাই। আধুনিক সমাজ-সংস্কারকেরও গীতা যাহা বলিয়াছেন তাহা মানিতে বাধা হওয়ার হেতু নাই। প্রথমেই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, সাম্যবাদী সমাজ গঠিত করাই কাম্য। তাহা করিতে হইলে সকলকে সমাজের

স্বার্থের জন্য কার্য্য করিতে হইবে। সমাজ-স্বার্থেই যদি সকল কার্য্য করিতে হয়, নিজের স্বার্থে কাজ করা যদি নিষেধ হয়, তাহা হইলে কে কি কাজ লইয়া কাল কাটাইবে তাহা লইয়া মারামারি থাকে না। সমাজের জন্য যাহা করণীয় তাহাই করিতে হইবে—এই দৃষ্টিতে দেখিলে কার্য্যের মধ্যে ছোট বড় থাকে না—সবই সমান কার্য্য। যখন সমাজ-সেবার জন্য·জ্ঞান দান করা, রক্ষা করা, বাণিজ্য করা ও পরিচর্য্যা করা দরকার, তখন সমাজের লোক দিয়াই এগুলি করাইয়া লইতে হইবে। কিন্তু কে কোন কাজ করিবে ইহা কে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে? নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে জন্ম। মানুষ যে পিতামাতার গুণাগুণ স্বভাবতঃই পায় ইহা ত প্রতিনিয়তই দেখিতেছি। কণ্ঠস্বর, গাত্রের বর্ণ, এমন কি চুলের বিশেষ ভঙ্গি, অথবা নম্রতা বা ক্রোধপরায়ণতা যে সন্তান অনেকটা পিতামাতার নিকট হইতে পায় তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু এই সকল গুণের জন্য বর্ণ বিভাগ নহে। পিতা যে বৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করেন, বর্ণ-ধর্ম্ম বলে, সন্তানের সেই বৃত্তিই সহজাত। সেই বৃত্তি সে সহজে আয়ত্ত করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে পারে। বর্ণ-ধর্ম্মের আবিষ্কর্ত্তা বাস্তবিক এই বৈজ্ঞানিক সত্যের পরিচয় পাইয়া বর্ণ-ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। পিতার বৃত্তি সন্তান স্বাভাবিক ভাবেই অবলম্বন করে—ইহা সত্য। যেখানে বর্ণ-ধর্ম্ম জানা নাই বা বর্ণ-ধর্ম্মের বন্ধন নাই, সেখানেও করে। ইংলণ্ড বা রাশিয়া বা যে-কোন দেশের লোক-সমাজে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, পুত্র পিতার জীবিকা গ্রহণ করিতেছে। 'ট্যানারের' ছেলে ট্যানার হইতেছে, কৃষকের ছেলে কৃষক হইতেছে ও বণিকের ছেলে বণিক হইতেছে।

সর্ব্বত্রই এইরূপ হইতেছে—ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। এই নিয়ম বা স্বাভাবিক সত্য আবিষ্কার করিয়া ঋষিগণ ইহাকে সমাজের কল্যাণকর পথে নিযুক্ত করিয়াছেন—বর্ণ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বর্ণ-ধর্ম্ম জগৎময় ক্রিয়াশীল ছিল ও আছে। যেমন নিউটনের পূর্ব্বেও মাধ্যাকর্ষণ ছিল, নিউটন কেবল তাহা আবিষ্কার করিয়া জগতের কল্যাণ করিয়াছেন এবং তাহার প্রয়োগ দ্বারা মানব জাতির নানা বৈষয়িক সুবিধা হইতেছে, বর্ণ-ধর্ম্মও তেমনি স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ঈশ্বরই ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন (চাতুর্ব্বণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ)। ঋষিরা কেবল ইহা কাজে লাগাইয়াছেন এবং অধ্যাত্ম জগতে সামাজিক সাম্য ও সুখ আনিবার পক্ষে এই আবিষ্কার ও প্রয়োগ নিউটনের আবিষ্কার ও প্রয়োগ অপেক্ষা অধিক কল্যাণকর হইয়াছে।

কর্ম্ম করা ত্যাগ-মূলক, অর্থাৎ যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিয়াই মানুষকে সমাজসেবা করিতে হইবে। 'কোন্ কাজকে বাছিয়া লইব'—এই প্রশ্নে বর্ণ-ধর্ম্ম নির্দ্দেশ দেয় যে, 'যে-যাহার বংশগত জীবিকা চার কোঠা অনুযায়ী গ্রহণ করিয়া নিজ ভরণ-পোষণ করতঃ স্বাভাবিক সোসিয়ালিষ্ট বা সাম্যবাদী হও। জীবিকার্জ্জন পিতার বৃত্তিতে করিলে সব চাইতে সহজে হইবে। মাষ্টার রাখিতে হইবে না—টেক্‌নিক্যাল স্কুলে পড়িতে হইবে না, ঘরের মাষ্টার—পিতার নিকট বা পরিবারের প্রধানের নিকট শিক্ষা করারই প্রচুর অবসর থাকিবে। সেই কর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকার্জ্জন করিয়া অবশিষ্ট শক্তি সমস্তই যে কোনও কর্ম্ম নিযুক্ত করাতে কাহারও খেদ থাকিবার কথা নাই।' বর্ণ-ধর্ম্মের বাঁধন পীড়াদায়ক কে মনে করিবে? যে স্বার্থের জন্য, ভোগের জন্য, নিজের বিলাস সুখের জন্য কর্ম্ম করিতে

চায়। কিন্তু সাম্যবাদী সমাজ এই ইচ্ছাকে সংযত করিতে বাধ্য। যে যত ইচ্ছা ভোগ করিব বা ভোগ করিবার পথ লইব, অথচ সামাজিক সাম্য—সোসিয়ালিজম্ চাই, মন হইতে এই প্রকার হেঁয়ালী সাফ্ করিয়া ফেলিলেই ঋষিদের বর্ণ-ধর্ম্ম ব্যবস্থার সঙ্গতি অন্ধকারের মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। কালিদাসের পুত্র কালিদাস হয় না—প্রতিভা বংশানুক্রমিক নহে, বর্ণ ধর্ম্মের সম্বন্ধে এই প্রকার বক্রোক্তির অবকাশ নাই। বর্ণ-ধর্ম্ম প্রতিভা বিকাশের ষোল আনা স্থান রাখিয়াছে, বরঞ্চ তদুপরি সকল কর্ম্মেই বিশেষজ্ঞ করিবার স্বাভাবিক পথ খুলিয়া দিয়াছে। বর্ণ-ধর্ম্মের এই ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ইহাও স্বীকার করি যে, আজ যে ব্রাহ্মণ দোকানদারী করে, বাণিজ্য করে বা পরিচর্য্যা করিয়া বামন-ঠাকুরের পদ লইয়া বসিয়াছে সে বর্ণ-ধর্ম্ম লোপকারী। আজ বর্ণ-ধর্ম্মের নাম লইয়া মিথ্যাচার আস্ফালন করিতেছে ইহা নিষ্ঠুর সত্য। বর্ণ-ধর্ম্মের নামে মিথ্যাচার আস্ফালন করিতেছে বলিয়াই আমাদের কর্ত্তব্য হইবে সে মিথ্যাচার নাশ করা। বর্ণ ধর্ম্মটাই নাশ করিবার জন্য আঘাত করিতে যেন উদ্যত না হই।

বর্ণ-ধর্ম্মে মনুর বিধি-নিষেধ

পাঠক বলিতে পারেন, শাস্ত্র-সম্মত বর্ণ-ধর্ম্ম সমর্থনীয় ও জন্ম দ্বারা জীবিকা নির্দ্দেশ মঙ্গলময় জানিলেও মনুর কতকগুলি ব্যবস্থার ও বাক্যের সমর্থন করা যায় না। প্রথমেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির উদ্ভব সম্বন্ধে উচ্চ নীচের নির্দ্দেশে সাম্যবাদের মাথায় লগুড়াঘাত করা হয়। এগুলি সম্বন্ধে কি বলিবার থাকিতে পারে? ধৈর্য্যের সহিত বিচার

করিলে অনেক আপাত-নিষ্ঠুর বিধানের মধ্যেও মঙ্গলময় উদ্দেশ্যই দেখিতে পাইব।

প্রথমেই ধরা যাক্, বর্ণ চারিটির উদ্ভবের কথা। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে ও শূদ্র ব্রহ্মার পা হইতে জন্ম লইয়াছে—এ কথা স্বীকার করায় আমাদের সাম্যবাদ কোথায় নষ্ট হয় দেখা যাক্। বৃহদারণ্যক প্রাচীনতম উপনিষদ। তাহাতে দেখিতেছি যে, সমাজ নিজ প্রয়োজনে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছে। প্রথমে কেবল ব্রাহ্মণ ছিল, তাহাতে সমাজ চলিল না। তারপর তেজময় ক্ষত্রিয় সৃষ্টি হইল, তাহাতেও চলিল না। তখন বৈশ্য সৃষ্টি হইল, কিন্তু তাহাতেও সমাজ চলে না। তখন শূদ্র সৃষ্টি হইল। সমাজের চারি অঙ্গ সমাজের প্রয়োজনেই উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার পর মনুর কথা ত ঐ উক্তি সমর্থনকারী রূপক মাত্র। শূদ্র ব্রহ্মার পা হইতে জন্ম পাইয়াছে, ইহার মানে শূদ্র সমাজ-দেহের পায়ের মত। পা সমস্ত দেহটার ভার বহন করে। শূদ্র সমস্ত সমাজের ভার সত্যই বহন করে। তাহারা মাটি কোপাইবে, কাঠ কাটিবে, জল তুলিবে তবেই সমাজ চলিবে। পা সমাজ-দেহকে লইয়া চলিয়া বেড়ায়। যদি এই পা পীড়িত হয় তবে মানুষ পঙ্গু হয়। সমাজের শূদ্ররূপ পা যদি পীড়িত হয়, তবে সমাজও পঙ্গু হইয়া পড়ে। আজ ত কেবল পা পীড়িত নয়—মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ পীড়িত। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন। মুখমণ্ডলের মধ্যে মস্তকও আসিয়া পড়ে। সমস্ত দেহের ওজনের তুলনায় মাথাটার ওজন বিশেষ কিছু নয়, তেমনি সমাজের লোক-সংখ্যার তুলনায় ব্রাহ্মণ একেবারেই হাল্কা বটে। অথচ অল্প-সংখ্যক ব্রাহ্মণই সমাজ নিয়ন্ত্রণ করেন; বশিষ্টাদি করিতেন—সাম্যবাদী

লেনিনের দল স্বাভাবিক অধিকারেই আজও তাহা করিতেছেন। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব গুরু। দেহের জন্য মস্তিষ্কের যে স্থান—সমাজের জন্য ব্রাহ্মণেরও সেই স্থানই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া বড় ছোট ভেদ করার ত কথা নাই। মাথাটা কাটিলে পা চলিবে না, পা কাটিয়া ফেলিলে মাথা মরিয়া যাইবে। বর্ণ সকলের উদ্ভবের উপমা লইয়া ক্ষুণ্ণ হইবার তাহা হইলে কিছু থাকে না।

তারপর ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের কথা—ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে কিছু করিলে তাহার নির্ম্মম শাস্তির কথা। ইহার নিষ্ঠুরতাও আপাত-ভয়ঙ্কর মাত্র। বিচার করিলে ইহাও পলাইবে।

মনুর শাস্তি বিধি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। মনুর ভিতরে আমি অপরাধ ও শাস্তির দুই দুই রকম ব্যবস্থা পাইতেছি। একই অপরাধের জন্য একবার আছে—প্রায়শ্চিত্ত, চান্দ্রায়ণ, উপবাস, আবার সেই অপরাধের জন্যই আছে হাত পা কাটিয়া ফেলা প্রভৃতি নিষ্ঠুর দণ্ড। সম্পত্তি-মূলক বা চৌর্য্যাদি অপরাধ-মূলক সকল প্রকার বিরোধের মীমাংসায় উপবাস ও অঙ্গচ্ছেদ এই দুই রকম পদ্ধতি ও শাস্তির বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে। এই বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আমি একটা পরম হিতকারী অবস্থার সন্ধান পাইয়াছি। আদর্শ সমাজে অপরাধীর অপরাধ ব্যাধি বলিয়া গণ্য হওয়ার যোগ্য। সুস্থ ও সবল সমাজে যে অপরাধ করে সে ব্যক্তি 'অসুস্থ, তাহাকে হাসপাতালে পাঠানো দরকার, তাহাকে কৃপা করা দরকার, তাহাকে শোধরাইবার চেষ্টা করা দরকার। বর্ণ-ধর্ম্মাশ্রয়ী সমাজ তাহাই করিবেন। কোনও অভিযোগ উপস্থিত হইলেই পঞ্চায়েৎ বসিত। পঞ্চায়েৎ উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া অপরাধীকে যে

বিধান দিতেন তাহা অপরাধ-ব্যাধি উপশম করার নির্দ্দেশ মাত্র। উপবাস দ্বারা শরীরকে ক্লিষ্ট করিলে মন নৈতিক উন্নতির অনুকূল হয়, সেই জন্য অপরাধের প্রতিকার ছিল উপবাস। উপবাস কাহাকেও বাঁধিয়া রাখিয়া করানো হইত না। যে যাহার ঘরে বসিয়া উপবাস করিত। উপবাস করিত, কি লুকাইয়া ভাত খাইত, ইহা দেখিতে যাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল না, আবশ্যকও ছিল না। যদি লুকাইয়া নির্দ্দেশ ভঙ্গ করে ত করুক, যে করে তাহারই ক্ষতি। আর ফলেই তাহার পরিচয়। যদি স্বভাব না শোধরায় তবে সে পুনরায় অপরাধ করিবে। তখনও আবার উপবাসের ব্যবস্থা। পুরাপুরি আদর্শ সমাজে এই ব্যবস্থাই চরম হইতে পারিত। কিন্তু যেখানে সমাজ আদর্শে পহুঁছায় নাই, সেখানে যে সব অপরাধকারীর পুনঃপুনঃ উপবাস দ্বারা পরিবর্ত্তন হয় না তাহাদের জন্য আর একটা ব্যবস্থা ছিল। তাহা হইতেছে ব্রাহ্মণ ও পঞ্চাইতের হাত হইতে মোকদ্দমা তুলিয়া রাজদ্বারে ফেলিয়া দেওয়া। যদি কেহ অপরাধী হয়, তবে সে সামাজিক শাস্তি লইবে, নিজেকে পরিবর্ত্তিত করিবে, আর নয়ত রাজার নিকট তাহাকে উপস্থিত করা হইবে—রাজা তাহাকে কারারুদ্ধ করিবেন অথবা অপরাধ অনুসারে অঙ্গচ্ছেদ করিবেন। এই সকল চরম দণ্ড বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইত কি না বলা যায় না। কিন্তু সামাজিক উপবাস-আশ্রয়ী শাসন কার্য্যকরী রাখার জন্য একটা জুজুর ভয় দেখানো এবং মধ্যে মধ্যে তাহা হয়ত প্রয়োগ করাও আবশ্যক হইত। কেবল ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্যই অঙ্গচ্ছেদ করার নির্দ্দেশ নাই, চৌর্য্যাদি অপরাধের জন্যও আছে। তবুও ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অপরাধের শাস্তির গুরুত্বে আশ্চর্য্য হওয়ার

কিছু নাই, বিশেষতঃ যে স্থলে সামাজিক শাসন দুষ্কৃতকারীকে নিবৃত্ত রাখিতে অক্ষম। ব্রাহ্মণ জ্ঞানদানকারী, ভিক্ষোপজীবী। তাহাকে যে কেহ মারিলে মারিতে পারে। তাহার দেহ ও মন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবার জন্য, আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক বিষয়ে চর্চ্চার জন্য বিশেষভাবে নিয়োজিত। এমন নিরীহ অথচ সমাজ-হিতকারী জ্ঞান-গুরুদের যে বিপন্ন করিবে এবং গ্রাম্য সামাজিক শাসনেও যে বিশুদ্ধ হইবে না, তাহার প্রতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থায় আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নাই।

তারপর মনুতে স্পষ্ট দেখিতে পাই, একই অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণ অধিক দণ্ডার্হ হইয়াছেন। ইহাই হওয়া উচিত। যাহার দায়িত্ব বেশী তাহার অপরাধের গুরুত্বও বেশী। বর্ণ-ধর্ম্মানুযায়ী ইহাই সুষ্ঠু ব্যবস্থা। কিন্তু মনু সংহিতা স্তরে স্তরে লেখা বলিয়া ইহার ঠিক বিপরীত নির্দ্দেশও পাই। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের গুরু অপরাধে লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা। পরস্পর বিরোধী এই ব্যবস্থার ভিতরে যাহা আমাদের বিচারে যুক্তি-যুক্ত, আমরা তাহাই গ্রহণ করিব—অপর ব্যবস্থা প্রক্ষেপ বলিয়া ত্যাগ করিব। দুইটি যখন একসঙ্গে লওয়া যায় না, তখন ইহাই ত একমাত্র পথ। এখানেও বর্ণ-ধর্ম্মের মর্য্যাদা মনুতে রক্ষিত হইতেছে দেখিয়া আমরা ব্রাহ্মণকৃত অত্যাচারের দায় হইতে বর্ণ-ধর্ম্মকে মুক্তি দিব।

এতদূর অগ্রসর হওয়ার পর এ কথা আলোচনা না করিলেও চলে যে, ব্রাহ্মণেরা স্বার্থবশেই এই বর্ণ বিভাগ করিয়াছেন কি না। বর্ণ-বিভাগ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে গুরু দায়িত্বের কাজ চাহিতেছে, আর তাহার ভিক্ষা ছাড়া অন্য উপার্জ্জনের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে, অথচ বসিয়া খাইবার অনুমতিও দেয় নাই, বরং উল্টা বলিতেছে—না খাটিয়া খাইলে চোর হইবে।

এমত স্থলে ইহা যে ব্রাহ্মণের লোভ-মূলক ব্যবস্থা—ইহা কল্পনা করাও দোষের।

যদি আমরা ত্যাগাশ্রয়ী সমাজ গড়িতে পারি, তবেই সামাজিক সাম্য সম্ভব হইবে। বর্ণ-ধর্ম্মে এই সমাজ গঠিত করিবার পূর্ণ উপাদান বিদ্যমান। তারপর কথা হইতে পারে যে, বর্ণ-ধর্ম্ম যদি এত উৎকৃষ্টই হইল, তবে আজ ইহার এ দুর্গতি কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, মানুষের কৃত সকল ব্যবহারের ভিতরেই দোষ প্রবেশ করিবার অবকাশ থাকিয়া যায়। বর্ণ-ধর্ম্মের ভিতরেও ছিদ্র পথে অন্যায় ঢুকিয়া উহার ব্যবহারিক রূপ দুষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কর্ম্ম-যোগের উল্লেখ করিয়া অর্থাৎ বর্ণ-ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, এই কর্ম্ম-যোগের কথা তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহা রাজর্ষিগণ জানিতেন। কিন্তু কালবশে এই জ্ঞান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা গীতা দ্বারা হইয়াছিল। যাহা একবার বিস্মৃত ও নষ্ট হইয়াছিল আজ আর একবার তাহা বিস্মৃত হইয়াছে। জ্ঞানীর কর্ম্ম ইহাকে উদ্ধার করা।

ভারতীয় সাম্য

সোসালিজম্ বা সাম্যবাদের অন্তস্তলস্থ ধারণা হইতেছে এই যে, প্রত্যেক মনুষ্যই সমষ্টির সুখের অনুকূল ভাবে দেহ ও মনের ব্যবহার করিবে এবং দেহ-পালনোপযোগী ভরণ পোষণ পাইবে। হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ হিন্দুদের সামাজিক প্রথার ভিতর সেই ভাবটিই পূর্ণ ও অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করিয়া সমাজ গঠন করিয়াছিলেন। সমস্ত কর্ম্ম ও অভিপ্রায় সমষ্টির অনুকূল থাকিবে অথচ ব্যষ্টির বিশেষত্বও উপেক্ষিত হইবে না, এমনি একটা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়া হিন্দুদের সংস্কারের মধ্যে মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। নিজের জন্য কর্ম্ম না করিয়া ঈশ্বর উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিবার সংস্কার ভারতীয় সমাজে এক কালে বদ্ধমূল ছিল। ভারতীয় সভ্যতার দ্বারাও এই ভাবটিই প্রধানতঃ অভিব্যক্ত হয়।

এই প্রকার সভ্যতার চরম পরিণতিতে কেহ নিজস্ব বলিয়া স্বার্থের জন্য কোনও দ্রব্য সঞ্চয় করিতে পারে না। সকলের সকল চেষ্টা এবং চেষ্টা-প্রসূত সকল ফলই সাধারণের সম্পত্তি হইয়া যায়, ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা সম্ভবে না। কিন্তু এই ধরণের সাধারণ ভাণ্ডার ও ব্যক্তির সম্পত্তি-হীনতা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল—এমন কাহিনী শোনা যায় না। ভারতীয় রাজনীতি শাস্ত্রে এই ব্যবস্থার উল্লেখ নাই বলিয়াই ভারতীয় সভ্যতা সোসালিজম্ বা সাম্যবাদের অভিমুখী নহে—এমন কথাও বলা যায় না। ভারতীয় সভ্যতার এই ধারা চোখে না পড়ায় আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নাই। ভারতীয় সভ্যতায় সাধারণের জন্য

উদ্দিষ্ট শ্রমাগার বা মানুষ মাত্রের জন্যই সম্পত্তি সৃষ্টি চোখে পড়ে না, কেন না ইহা অত্যন্ত ব্যাপক ও সাধারণ। যাহা সাধারণ তাহা চোখে পড়া মুস্কিল, যাহা অসাধারণ তাহা জোর করিয়াই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোনো পল্লীতে যখন চাউলের কল ধূম উদ্গীরণ করে তখন তাহা সকলেরই চোখে পড়ে ও তাহার বিষয় মনে থাকে, কেন না তাহা অস্বাভাবিক। কিন্তু ঐ একটা চাউলের কল হওয়া হেতু ঢেঁকীগুলি যে গৃহস্থের গৃহে গৃহে অচল হইয়া আছে, তাহা কাহারও চোখে পড়ে না। ঢেঁকী গৃহে গৃহে ব্যাপ্ত হইয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল। তেমনি রাশিয়ায় সোভিয়েটের সাম্যবাদের কল যে ধূম উদ্গীরণ করিতেছে তাহা সকল জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, অথচ ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ভিতর দিয়া যে সাম্যবাদ ক্রিয়াশীল তাহা অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত রহিতেছে। যে উদ্দেশ্য, যে ফল লাভের জন্য সোভিয়েট রাশিয়া ব্যস্ত, সেই উদ্দেশ্যই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম দ্বারা সাধন করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল। সোভিয়েটদের দ্বারা এখনো নিঃসম্পত্তি সমাজ সৃষ্টি হয় নাই এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দ্বারাও হয় নাই। কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য একই—যদিও পথ বিভিন্ন।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির লোপ হইবে, সাধারণের সম্পত্তির সৃষ্টি হইবে, সকলেই কর্ম্ম করিবে, কেহ বসিয়া খাইবে না—সমাজে এই ব্যবস্থা-প্রতিষ্ঠার দুইটি উপায়ে চেষ্টা হইতে পারে। এক উপায় গোলা-বারুদের ভয় দেখাইয়া, সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া, মানীকে অপমান করিয়া। এই উপায়ই সোভিয়েট রাশিয়া গ্রহণ করিয়াছে ও অত্যাচারের আগুনে সমাজকে পোড়াইয়া শুভ করিবার পরীক্ষা চালাইতেছে। ব্যক্তিগত

সম্পত্তি লোপ করিবার অপর উপায় হইতেছে, ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সম্পত্তি সৃষ্টি করিবার ক্ষুধাকেই নষ্ট করা। ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ করার এই শেষোক্ত উপায় ভারতবর্ষ গ্রহণ করিয়াছিল। ব্যক্তির স্বার্থ-বুদ্ধিকে ভারতবর্ষ কেবলই খর্ব্ব করিয়া আসিয়াছে। একথা বলি না যে. ভারতবর্ষ আদর্শ স্থানে পঁহুছিয়াছিল। কিন্তু এ কথা সত্য যে, ব্যক্তির স্বার্থ-বুদ্ধিকে লোপ করিয়া, যাহাতে জাগতিক মঙ্গল হয় সেই বুদ্ধি জাগ্রত করিবার সাধনাই ভারতীয় সাধনা। আইন করিয়া বা বলপূর্ব্বক সামাজিক সাম্য পাওয়ার বস্তু নহে। মনোবৃত্তি যদি স্বার্থান্বেষী থাকে, কেবল আইন দ্বারা সমাজকে অসমতা ও তজ্জনিত পীড়া হইতে বাঁচাইতে পারা যায় না। পরন্তু যদি স্বার্থ-বুদ্ধি সমাজ মধ্যে দিন দিন শুদ্ধ হইতে থাকে, তবে সমাজ যে ভ্রাতৃত্বের দিকে অগ্রসর হইবে তাহাতে সন্দেহ থাকে না। ভারতবর্ষ আচার-নিয়মে, পূজা-অর্চ্চনায়, বাক্যে ও কল্পনায় এই আদর্শই মানিয়া লইয়াছে যে, যে-ব্যক্তি আত্মকারণে কর্ম্ম করে সে পাপী।

"ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ"

বিশ্ব-মানবের এই ভ্রাতৃত্ব-বোধের উপরই ভারতের সামাজিক সৌধ গঠিত। জনকাদি ঋষিগণ সেই সৌধের ভিত্তি গঠিত করিয়া গিয়াছেন। জনক ছিলেন রাজা—টাকা-পয়সা, কড়া-ক্রান্তি, জমি-জমার হিসাব তাঁহাকে করিতে হইত, অথচ দৃষ্টি ছিল তাঁহার পরব্রহ্মে। রাজপ্রাসাদে আগুন লাগিল—রাজা জানিলেন আগুন লাগিয়াছে এবং আগুন নিভাইবার যে ব্যবস্থা করা দরকার সে সকল করা হইয়াছে; তখন তিনি নির্ব্বিকারে নিজ কার্য্য করিতে লাগিলেন। রাজপুরী ছাই হইয়া

গেল, জনকের বিকার নাই। এই যে নির্লেপ ভাব, সংসারে থাকিয়া টাকা-পয়সা, সোনা-দানা লইয়া ব্যাপার করিয়া, পুত্র-কলত্রাদির বিবাহ দিয়া তবুও পদ্মপত্রে জলের ন্যায় সাংসারিক ভোগে নির্লিপ্ত থাকার সাধনা, ইহাই জনকাদি ঋষিগণের সাধনা। জনকাদি ঋষিগণ ভারতবর্ষকে সেই শিক্ষাই দিয়াছেন, সেই আদর্শেই সমাজ গড়িয়া গিয়াছেন। সেই শিক্ষার অনুবর্ত্তী সমাজ জগতের শ্রেষ্ঠতম সভ্যতার অধিকারী, উহা সর্ব্বব্যাপক প্রেম, সাম্য ও সোসালিজমের আধার। চারিবর্ণের সৃষ্টি দ্বারা কর্ম্ম বিভাগের মূলেও সেই একই সাধনা। এই সাধনার বিকাশে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধনের ভেদ থাকিয়াও থাকে না।

যে যাহার দৈনিক ক্ষুদ্র প্রয়োজন মিটাইয়া উদ্বর্ত্ত শ্রম, চিন্তা ও শক্তি সমাজকে দেওয়ার পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই শক্তি সংহত করিবার একটি সাধারণ কেন্দ্রের আবশ্যক হয়। রাজা সেই কেন্দ্র। সাধারণের সমস্ত উদ্বর্ত্ত ধনের তিনি রক্ষক। সাধারণের জন্য যাহা কিছু করণীয় যদি তিনি তাহা করেন তবে সে রাজার দ্বারা সমাজের কেবলই হিত হয়। এমন রাজা জনসাধারণের সেবক মাত্র। তিনিই সত্যিকার 'গণদাস' কিন্তু 'গণপতি' নহেন। এমন রাজা ধনৈশ্বর্য্যশালী হইয়াও নিঃস্ব। তিনি রাজ্যপাটের বে-নামদার অর্থাৎ স্বত্বহীন মালিক। এই প্রকার রাজার দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যায় যে, সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও সাধারণের সহিত এক হওয়ার পথ আছে। যে রাজা উক্ত প্রকার গুণের আধার তাঁহাকে সোসালিষ্টদের আদি পুরুষ বলা যায়। রাজা যেমন বিত্তশালী হইয়াও বিত্তহীনের আদর্শ হইতে পারেন, তেমনি তিনি প্রত্যেক প্রজারই সমাজের সেবক হইবার আদর্শ সৃষ্টি করেন।

আদর্শ এই যে, যাঁহার যাহা আছে,—বুদ্ধি, শক্তি বা বিত্ত তাহা সাধারণের জন্য নিয়োগ করা। যদি রাজা ও প্রজা উভয়ে এই কার্য্য করেন তবে রাম-রাজ্যের পত্তন হয়।

এই আদর্শ যে পথ দেখাইয়াছে ভারতীয়েরা অনেক দূর সেই পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তথাপি গন্তব্য পথ দূরে রহিয়াছে। ভারতীয়েরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দীক্ষায় এই সাম্য আনয়ন করে সম্পত্তির উপর নির্লোভতা বিস্তার করিবার জন্য দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন। যে সাধক, সে সমস্ত সম্পত্তি ও শক্তি, অর্জ্জিত বা অনর্জ্জিত হউক, তাহা দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে। যে ততটা পারে না, সে সেই আদর্শ মানিয়া যাহা পারে তাহা করে। সেইরূপ করার আদর্শ আছে বলিয়াই ভারতে ধনী দরিদ্রের সংঘাত কল্পনারও বাহিরের বস্তু। আজিকার দিনে যখন সারা দেশ দৈন্য-পীড়িত তখন সামাজিক সুখের জন্য মরীচিকা-মুগ্ধের ন্যায় শূদ্র-প্রাধান্যের প্রতি, 'লাল পতাকার' প্রতি ভারত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না, ভারতের অন্তরে যে সুধা সঞ্চিত আছে, সেই ভাণ্ডারের সন্ধানই সে লইবে ও ব্যবহার করিবে।

বাংলার ভদ্র সম্প্রদায় যে চাষীর নিকট হইতে জমি ভাগে চষিয়া ল'ন, তাহাতে জমিদারের অপেক্ষাও অধিক অর্থ বা শ্রম কৃষকের নিকট হইতে শোষিত হয়। এ কথার উত্তরে প্রশ্ন হইতে পারে, তবে ভদ্রেরা কি করিবে? ভদ্র ভদ্রতা রক্ষা করিবে, সে আর্ত্তের জন্য পূর্ব্বে ব্যবস্থা করিয়া তবে নিজে সম্পত্তি ভোগ করিবে। ইহাই সত্যকার ভদ্র ও শিক্ষিতের কাজ। যে চাষীর দিন গুজারণ জোটে না তাহাকে খাটাইয়া ভদ্রের বিলাসী হওয়ার অধিকার নাই। এই আদর্শ মানিয়া লইলে

সকল দ্বন্দ্ব চুকিয়া যায়। চাষীর যেমন চলিতেছে আমারও তেমনি চলিবে, এ কথা বলা বীরের কাজ ও ভদ্রের কাজ। বাঙ্গালী ভদ্র এই কথাই বলিতে পারেন। এই বীরত্ব ও সাহস যদি সঞ্চিত হয়, তবে সমাজের মধ্যস্থ পুঞ্জীভূত পাপ ও জড়তা দূর হইয়া সমাজ নবজীবন লাভ করিবে এবং ভারতবর্ষ পুনরায় নিজ বিশিষ্ট সভ্যতার ধারা অবলম্বন করিয়া সামাজিক সাম্যের পথে, জাগতিক সোসালিজমের পথে যাত্রা করিবে।

দুঃখ-নিবৃত্তি

রাষ্ট্রীয় জীবনে পরাধীনতা গভীর দুঃখদায়ক। পরাধীনতা নাশ করিয়া স্বাধীন হওয়ার যে চেষ্টা তাহাও দুঃখ-নিবৃত্তিরই চেষ্টা। মহাত্মা গান্ধী যখন কংগ্রেস-পরিচালনার ভার লইয়াছিলেন তখন তিনি দুঃখ-নিবৃত্তিকেই প্রাধান্য দিয়া কর্ম্মের পন্থা স্থির করিয়াছিলেন। এ পথকে তিনি অহিংস-অসহযোগ নাম দিয়াছিলেন। তাঁহার মতের অন্তর্নিহিত সত্যতা উপলব্ধি করিলেও পূজ্য নেতাদের মনে উহার কুশলতা সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। সেই হেতু তিনি জেলে গেলে স্বরাজ লাভের চেষ্টা যে রূপ গ্রহণ করে তাহা অহিংস-অসহযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

অহিংস-অসহযোগ দ্বারা কেবল যে পরাধীনতার দুঃখেরই নিবৃত্তি হইবে তাহা নহে, পরন্তু সর্ব্বপ্রকার দুঃখেরই নিবৃত্তি হইবে—ইহাই এই কল্পনার ও কর্ম্ম-পন্থার বিশেষত্ব। "স্বরাজ" এই কল্পনারই অভিব্যক্তি। বিদেশী শাসন অপসৃত হইলেই সকল প্রকার দুঃখ-নিবৃত্তির সম্ভাবনা দেখা যায় না। বিদেশী শাসন দূরীভূত হইয়া যদি তাহার স্থলে ইংলণ্ডের ন্যায় পর-রাজ্য-জয়েচ্ছু সাম্রাজ্যবাদীর মোহ-প্রলুব্ধ শাসনের সূত্রপাত হয়, অথবা বোলশেভিক বা লেনিনীয় শাসনের পত্তন হয় তাহা হইলেও দুঃখের নিবৃত্তি হইল না। ইংলণ্ড ভারতের পীড়া উৎপাদন করিয়াছে বটে, কিন্তু নিজ দুঃখের নিবৃত্তি করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের মত বিশাল রাজ্যকে নিজ ভোগের উপকরণ করিয়াও তাহার ক্ষুধা মিটিতেছে না। ইংলণ্ডে আজ বেকার সমস্যা গুরুতর। আবার রাশিয়ার সংঘর্ষ-

মূলক শাসন-নীতিতে একদল অপর দলকে পিষ্ট করিয়া ধ্বংস করিয়াছে সত্য, শ্রমিক ও কৃষক মিলিয়া ধনিকের প্রাধান্য নষ্ট করিয়াছে সত্য, কিন্তু ধনের মোহ তাহাতে নষ্ট হয় নাই। লোভ জিনিষটাই এমনি। একটা বিষয়ে লোভ মিটিলে অপর একটার জন্য ক্ষুধা বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, দুঃখ বাড়িতে থাকে।

ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন সাম্যতে।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ো এবাভিবর্দ্ধতে॥

পরাধীনতার দুঃখ মিটাইবার চেষ্টার পশ্চাতে এমন সার্ব্বজনীন ভাব থাকা চাই, যাহাতে স্বাধীন ভারতবর্ষ আধুনিক জাতি সমূহের আর্ত্তির মধ্যে নিজেকে না নিক্ষেপ করে। সর্ব্ব-দুঃখ-বিমুক্ত রাষ্ট্রীয় অবস্থাই ভারতবর্ষের আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজ। এমনি স্বরাজ গান্ধীজী ভারতবর্ষে আনিতে চাহেন। ইহার জন্য তাঁহার কৃচ্ছ-সাধন, তাঁহার তপস্যা ও সাধনার অন্ত নাই, তাঁহার ধৈর্য্যেরও অন্ত নাই। ভারতবর্ষ জীবে মানবে চরাচরে অখণ্ড ঐক্য দেখিয়াছে, সেই অখণ্ড ঐক্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নিজ সমাজকে গঠিত করিয়া তুলিয়াছে। সেই সন্ধান গান্ধীজী পাইয়াছেন। বহুর মধ্যে এককে এবং একের মধ্যে বহুকে অনুভব করার সাধনায় ভারতবর্ষ অগ্রণী। এবং এই সাধনা ভারতবর্ষের মনীষীদিগের কল্পনায় একটা অপূর্ব্ব বিরাটত্ব দান করিয়াছে।

নানা দুঃখের পীড়ায় মানুষ পীড়িত। ক্ষুধার পীড়া আহার করিলে মিটে, কিন্তু পরে ক্ষুধার উদ্রেক হয়। ব্যাধির দুঃখের উপশম চিকিৎসায় হইতে পারে, কিন্তু আবার পীড়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। এই হেতু ভারতের ঋষিগণ একেবারে দুঃখের মূল উৎপাটন করিতে ইচ্ছুক

হইয়া সন্ধান করিয়াছিলেন এমন কিছু, যাহাতে সকল প্রকার দুঃখের সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্তি হয়। সকল দুঃখের হেতু খুঁজিয়া বাহির করিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল। তাঁহারা সেই হেতু দুঃখ সম্পূর্ণরূপে দূর করিবার পন্থাও আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং নিজেরাও সেই পন্থা অনুসরণ করিয়া জগতের হিতের জন্য তাহার উপযোগিতাও দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জানিয়াছিলেন—কামনার ক্ষয়ে, সর্ব্বভূতে ঐক্য দেখায়, ও ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করায় দুঃখের নিবৃত্তি হয়। তাঁহাদেরই আর একজন, মহাত্মা গান্ধী, পুরাতন সন্ধান নূতন করিয়া জানিয়াছেন এবং রাষ্ট্রীয় দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার জন্য স্বীয় জ্ঞান নিয়োগ করিতেছেন।

এক দেশ যে আর এক দেশের সহিত বৈরিতা করে তাহার মূলে আছে লোভ, হিংসা বা ভয়। দেশের বৈরিতার পশ্চাতে সমাজেরও সম্মতি আছে। সমাজের বৈর-ভাবই রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া প্রকট হইয়া পড়ে? সমাজের বৈর-ভাব ব্যক্তিগত বৈর-ভাব জাত। ব্যক্তিগত বৈরিতা দূর করিবার অথবা প্রতিরোধ করিবার শক্তিও সমাজের মধ্যেই আছে। মানুষের সমষ্টি-শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ দৈবী-ভাবাপন্ন হইয়া রাষ্ট্রকে শ্রেয়ের পথে চালিত করিতে পারে, অসুর-ভাবাপন্ন হইয়া জঘন্য পথেও চালিত করিতে পারে, আবার একটা মাঝামাঝি অবস্থাতেও রাখিতে পারে। 'সামাজিক ব্যবস্থার সহিত ব্যক্তির এবং রাষ্ট্রের নৈতিক প্রগতি নিগূঢ় যোগে যুক্ত। ভারতবর্ষের জ্ঞানী ও পর-হিত-ব্রত ঋষিগণ সমাজকে নির্লোভ করিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং প্রয়োগ করিয়াছিলেন। লোভ জীবিকা উপার্জ্জনের পথেই প্রকট

হয়। জীবিকা উপার্জ্জন স্বভাবজাত ক্ষমতার স্ফুরণ। এই স্বাভাবিক ভাব নিজ নিজ বংশগত বা পিতৃগত কর্ম্মেই মানুষকে নিয়োগ করে। লোভই বংশগত জীবিকা অর্জ্জনের পথ হইতে মানুষকে বিচ্যুত করে। বংশগত জীবিকা অর্জ্জনের স্বাভাবিক নিয়ম অবলম্বন করিয়াই লোভ দমনের পথ ঋষিগণ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় সমাজে জীবিকা সেইজন্য বংশানুক্রমিক। ছুতোরের পুত্র ছুতোরের কাজ করিয়াই সমাজ-সেবার দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিবে, উপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায় অন্য বৃত্তি গ্রহণ করিবে না। উপার্জ্জন উদ্দেশ্য না করিয়া সেবার জন্য যে কোনও বৃত্তি অবলম্বন করা যাইতে পারে, কিন্তু অর্থোপার্জ্জন কর্ম্ম পৈত্রিক ব্যবসাতেই নিবদ্ধ। এই সহজ, স্বাভাবিক ও সংক্ষিপ্ত উপায়ের উপর সামাজিক সাম্যের ও সামাজিক অহিংসার প্রতিষ্ঠা। এতদপেক্ষা সামাজিক সাম্যের আর কোনও শ্রেষ্ঠতর পথ আবিষ্কৃত হয় নাই। যুগ যুগের পরীক্ষা ইহা সহ্য করিয়াছে। এই ব্যবস্থায় লোভ বৃত্তিটার উপর সীমা-রেখা টানা পড়ে, অথচ উদ্ভাবনী শক্তিরও নূতন নূতন ক্ষেত্রে কার্য্য করিবার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহাতেই সমাজ স্বাভাবিক ভাবে বৈরিতা দমন করিবার বা অহিংস হইবার শক্তি সঞ্চয় করে। ভারতীয় সমাজে অর্জ্জিত ও ব্যবহৃত এই শক্তি জাগতিক বৈরিতা ও তজ্জাত দুঃখ নিবারণ করিতে সক্ষম। সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারা হিংসার মূল নষ্ট করিয়া অহিংসা দ্বারা সামাজিক বৈরিতা রোধ করার প্রশস্ত পথ ভারতেরই। রাষ্ট্রীয় সম্পর্কে অহিংসার প্রয়োগও ইহারই পরিণতি। হিংসা না করিয়া অপরের হিংসার প্রতিরোধ বৃত্তির নাম ‘অসহযোগ’। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ইহা নূতন প্রযুক্ত হইতেছে।

ইহাই গান্ধীজীর আবিষ্কার এবং জগতের কল্যাণের জন্য তাঁহার সুমহৎ দান। অহিংসা এবং অসহযোগ দ্বারা সমগ্র জাতিকে শুদ্ধ রাখার নূতন পথের প্রবর্ত্তন গান্ধীজীই করিয়াছেন। ব্যক্তির, সমাজের ও জগতের দুঃখের একান্ত নিবৃত্তির পথ মহাত্মা গান্ধীর দ্বারাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ঈশ্বর আমাদিগকে সেই পথে চলিবার শক্তি দান করুন।

হিংসার পাশব বৃত্তিটা মানুষের ভিতর কখনো প্রসুপ্ত, কখনো জাগ্রত ভাবে আছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও এই পাশব বৃত্তি প্রথমেই জাগিয়া উঠে। কেহ মারিলে তাহার উপযুক্ত জবাবই হইতেছে পাল্‌টা আর এক ঘা দেওয়া। যে বৈদেশিক শক্তি ভারতবর্ষকে নিপীড়িত করিতেছে প্রতিকারের জন্য তাহাকে আঘাত করাই প্রাথমিক সংস্কার। যদি প্রকাশ্য আঘাতের উপায় বা অস্ত্র হাতে না থাকে তবে গোপনে অস্ত্রের সংগ্রহ ও ব্যবস্থা করাও এই প্রতিকারের প্রাথমিক সংস্কার। গান্ধীজী বলেন যে, ইহা জয়-পরাজয়ের পাশা খেলা। এই খেলায় কোনও পক্ষেই বৈরিতা শেষ হয় না। আজ সাময়িক জয় হইলেও কাল আবার হার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পশুবলের সাহায্যে অবস্থান্তর ঘটাইলে পশুবলের প্রতি যে মর্য্যাদা দেওয়া হইবে, তাহার ফলে সেই পশুবলই নূতন নূতন দুঃখের সৃষ্টি দ্বারা সমাজকে নির্য্যাতিত করিবে। রাষ্ট্রীয় দুঃখের নিঃশেষে অন্ত হওয়ার পথ ইহা নহে।

জয় যদি করিতে হয় তবে মন জয় করাই একান্ত কাম্য। যে ব্যক্তি মনকে বশীভূত করে, নিঃশেষে তাহার দুঃখের নিবৃত্তি হয়, মোক্ষ তাহার অধিগম্য হয়। সামাজিক মনকে বশ করিলে সামাজিক দুঃখও নিঃশেষে অন্তর্হিত হইবে। প্রেমই সেই বশীকরণ মন্ত্র, অহিংসা তাহার

নামান্তর। পিতৃগত জীবিকা গ্রহণ রূপ বর্ণ-ধর্ম্ম অবলম্বনের দ্বারা ভারতবর্ষ এই বিশ্বজনীন প্রেমের পরিচয় দিয়াছে। ফরাসী দেশে বিপ্লবের সময় ভ্রাতৃত্বের রব উত্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা অলীক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। রাশিয়ার যে সাধারণ সাম্যবাদ লইয়া একটা বড় নজীর উত্থাপিত হইয়াছে, তাহার ভিতর ধনী ও নির্ধনে অসাম্য ও ভেদগত দুঃখ বর্ত্তমান আছে। ঐ সকল দেশের প্রচেষ্টার উৎসও অবশ্য প্রজার দুঃখ-নাশ। কিন্তু সমগ্র জিনিষটি যে ভাবে আমাদের ঋষিগণ দেখিয়াছিলেন, এই সকল চেষ্টায় সে সকলের অভাব। তুলনায় এ সকল প্রচেষ্টা বা পরীক্ষা অত্যন্ত কাঁচা রকমের দেখা যায়। সার্থকতা লাভ করিতে হইলে পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্যতার মধ্য দিয়া, অনেক ক্লেশের ভিতর দিয়া সংস্কৃত হইয়া ঐ সকল প্রচেষ্টাকে বিশ্বজনীন প্রেমের পৈঠায় আসিয়া পঁহুছিতে হইবে। বিশ্ব-প্রেম বিশ্বের সকলের প্রতিই বিস্তৃত। সে প্রেম কাহাকেও শত্রু জানে না, ক্যাপিটালিষ্টকেও না, ল্যাঙ্কাশায়ারকেও না। সেই উপায়ের দ্বারাই রাষ্ট্রীয় দুঃখকে সম্পূর্ণভাবে নাশ করা যায় যে-উপায় সমাজের স্তরে স্তরে ক্রিয়াশীল হইতে পারে, যাহা এক দিকে বিভিন্ন দেশের মানবের ও অপর দিকে মানবের সহিত অন্যান্য জীবের পারস্পরিক সম্পর্কে ক্রিয়াশীল হইতে পারে। সত্য ও অহিংসা দ্বারা অঙ্গাঙ্গী ভাবে ইহার ভিত্তি প্রস্তুত। আবার ইহা এমন উদার যে, সমস্ত সমাজকে সমস্ত বিচিত্রতার সহিত ইহা ধারণ করিতে সক্ষম। অহিংসার মন্ত্র-সাধক কোনও কৃত্রিম উপায়ে এই বৈচিত্র্যের নাশ করিয়া গায়ের জোরে সাম্য স্থাপনের চেষ্টা করেন না। সঞ্চয় বৃত্তির বা ধনাধিকার স্পৃহার সহিতও ইহার

বিরোধ নাই। অহিংসা এ সকলকে সংযত করে মাত্র। মানুষের অধিকার ভেদও ইহা অস্বীকার করে না। সকল মানুষ সমান নয়, আর গায়ের জোরে যেখানেই তাহাকে সমান করার চেষ্টা হইয়াছে সেইখানেই সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

দুঃখের সম্পূর্ণ বিনাশ কামনায় অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত যে স্বরাজ গান্ধীজী ভারতবর্ষে আনয়নের প্রয়াসী, তাহার কি প্রকার রূপ হইবে আজ তাহার বিচার নিষ্প্রয়োজন। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও প্রেমে, নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া, গুরু-শিষ্য, ধনী-নির্ধনে ভেদ মানিয়া, যাজ্ঞিক, যোদ্ধা, বৈশ্য ও শূদ্রের বৃত্তি ভেদ স্বীকার করিয়াই এই রূপ ফুটিয়া উঠিবে। কাহারও সহিত, এমন কি যে ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষকে নিপীড়িত করিতেছে তাহার সহিতও প্রেমের ও ব্যবহারের মর্য্যাদাযুক্ত যোগ রাখা এই স্বরাজ কল্পনার বহির্ভূত নহে। এবম্বিধ স্বরাজ আনয়নের জন্য নির্ভীক ও নম্র, ধীর ও কৌশলী পুরুষ ও নারীর আবশ্যক। তাঁহাদিগকে ডাক দিয়া আজ গান্ধীজী সেই পথ প্রস্তুত করিয়া যাইতে বলিতেছেন, যে পথে অগণিত জন-সাধারণ তাহাদের দুর্ব্বলতা ও দ্বিধা লইয়া প্রবেশ করিয়াও দুঃখের অন্তে পঁহুছিতে পারিবে। মহাত্মা গান্ধীর এই সাধনার জয় হউক।

শিক্ষায়তন

পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের জীবনের ভিতর নানা রকমের জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। বাহ্যাড়ম্বর ও বিলাসের সহস্র উপাদানে আজ আমাদের জীবন পরিপূর্ণ। তাই আমাদের জীবনে দুঃখের পরিমাণও ঢের বাড়িয়া গিয়াছে। মানুষের জীবন-যাত্রার পদ্ধতি যতই জটিল হইবে তাহার দুঃখের মাত্রাও যে ততই বাড়িয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই জন্যই ভারতবর্ষের সাধনা ছিল জীবনকে সহজ করিবার—সরল করিবার সাধনা। ভোগের দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না, তাহার লক্ষ্য ছিল ত্যাগের দিকে। অভাব তাহার বেশী ছিল না, তাই অভাব পূর্ণ না হওয়ার দুঃখও তাহার কম ছিল।

ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সাধনার আর একটা গুণ ছিল যে, তাহা মানুষের মনকে স্বার্থের দ্বারা সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিত না—নিজের সুখ-দুঃখের সঙ্গে পরের সুখ-দুঃখ মিশাইয়া তাহা একান্ত সহজ ভাবেই চিত্তের ভিতর একটি বৃহত্তর মানবতার অনুপ্রেরণা জাগাইত। এই জন্যই সেকালের বড় লোকদের বিলাস ছিল দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা, দীঘিকা খনন, অতিথিশালা স্থাপন প্রভৃতি।

দেড় শত বৎসরের বিদেশী শাসনে ও শিক্ষায় দেশের অবস্থার ও আদর্শের যে রূপান্তর সাধিত হইয়াছে আজ তাহাই আমাদের সর্ব্বনাশের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কারণ। সুতরাং বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব

হইতে দেশের লোকের মনকে মুক্ত করা ছাড়া এই সর্ব্বনাশের পথ হইতে ফিরিবার উপায়ও আর কিছু নাই। যে শিক্ষা ভারতের সহজ সরল জীবন-যাত্রার আদর্শ আবার ফিরাইয়া আনিতে পারে, আজ তাহাই আমাদের বাঁচিবারও পথ—মুক্তিরও পথ।

শিক্ষার গলদ

একবার বাস্তব ক্ষেত্রের দিকে তাকাইলে কথাটার ভিতরকার অমোঘ সত্য আরো স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে। আমরা যাহাকে উচ্চ শিক্ষা বলি, বহু বাঙ্গালীর ছেলে তাহাতে শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছেন। অনেক ছেলে এম-এ, বি-এ পাশ করিয়াছেন, কিন্তু দেশের দুঃখ তাহাতে কতটুকু কমিয়াছে? এবং দেশের সমস্ত লোকই যদি এম-এ, বি-এ পাশ করে তাহাতেই বা দুঃখ কতটুকু কমিবে? দেশের দুঃখ, দেশের দারিদ্র্য দূর করিবার শক্তি যে এই এম-এ, বি-এ পাশ-ওয়ালাদের নাই, তাহা যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লইয়া বাহির হইয়া আসিতেছেন তাঁহাদের ব্যর্থ জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বোঝা যায়। উপাধির কাগজে বাক্স ভরিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে অর্থের বিনিময়ে সেগুলি অর্জ্জিত হইয়াছে সে কাগজ ভাঙ্গাইয়া তাহার দামও পোষায় না। সারাজীবন দাসত্বের বোঝা মাথায় বহিয়াও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি আজ তাহাদের নিজেদের ও পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনও সংগ্রহ করিতে পারে না।

মনুষ্যত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে এ শিক্ষার গলদ আরও সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়। ইহা বিলাসের প্রতি আমাদের মনের ঝোঁকই

বাড়াইয়া দিতেছে, লোভেই মন ভরিয়া তুলিতেছে, কিন্তু শিক্ষার যাহা সার্থকতা—আমাদিগকে মানুষ হইতে শিখাইতেছে না; ভারতের সহজ ও সরল জীবন যাত্রার প্রতি আমাদের মনকে বিমুখ করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু প্রাচুর্য্যের সন্ধান দিবার শক্তি ইহার নাই। ফলে দেশের প্রায় প্রত্যেকটি জীবনই আজ অতৃপ্তিতে পরিপূর্ণ। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীনতার আকাঙ্খা প্রভৃতি যে সমস্ত চিত্ত-বৃত্তির সঙ্গে শিক্ষার যোগ অচ্ছেদ্য, এ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভিতর তাহাও সাড়া দেয় না। সামান্য উপার্জ্জন বা চাকরীর লোভেও আমরা মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতেছি। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি আমাদের ঝোঁক যত বেশীই হোক্ না কেন, ও শিক্ষা যে আমাদের উপযোগী নহে তাহা বলাই বাহুল্য। উহা আমাদিগকে আত্মিক সুখ হইতে যেমন বঞ্চিত করিয়াছে, তেমনি আমাদিগকে পার্থিব সুখেরও সন্ধান দেয় নাই।

বস্তুতঃ দেশের এই সব শিক্ষায়তন হইতে উপকারের কোন আশাই নাই। যদি ভারতবর্ষের আত্মাকে জাগাইতেই হয়, তবে নূতন ধরণের বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাই আবশ্যক, যে বিদ্যালয়ে আড়ম্বর থাকিবে না, পল্লীর প্রান্তে নিজেদের তপস্যার দ্বারা যাহার তপোবন রচিত হইবে।

আচার্য্যের আদর্শ

এজন্য একদিকে যেমন দেশের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার অন্যদিকে আবার তেমনি কতকগুলি ত্যাগী, মহাপ্রাণ কর্ম্মীরও প্রয়োজন—কতকগুলি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের আচার্য্যের আবশ্যক। যে আদর্শ একদিন ভারতবর্ষের ঋষিদের তপোবনকে শিক্ষার্থীদের আশ্রমে পরিণত

করিয়াছিল সেই আদর্শের অনুপ্রেরণা যদি ইহার আচার্য্যদের ভিতরে না থাকে তবে সে উদ্দেশ্য কখনো সফল হইতে পারে না। শিক্ষায়তনের আদর্শ যেমন উচ্চ, আচার্য্যেরও সেই অনুপাতে বহুগুণে গুণান্বিত হওয়া আবশ্যক। তাঁহার ভিতরে সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য থাকা চাই, তাঁহার চরিত্রে কোন খুঁত থাকিলে চলিবে না, তাঁহার সমস্ত কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের যোগ থাকা দরকার। এক দিকে তিনি যেমন বিনয়ী ও সহিষ্ণু হইবেন, অন্যদিকে আবার তেমনি তাঁহাকে দৃঢ় ও নির্ভীক হইতে হইবে। তিনি যাহাতে বিদ্যার্থীদিগকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে পারেন সেই জন্য চরকা ও আন্যান্য ব্যবহারিক শাস্ত্রেও তাঁহার নিজের সম্যক অধিকার থাকা প্রয়োজন।

সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা গোড়াতেই পাওয়া যাইবে—এরূপ অবশ্য আশা করা যায় না। কাজের ভিতর দিয়াই ধীরে ধীরে আদর্শ ও জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও যাঁহাদের শিক্ষা ও সাধনার ধারা এরূপ জীবনের উপযোগী নহে, আচার্য্যের দায়িত্ব যে তাঁহাদের দ্বারা পুর্ণ হইতে পারিবে না তাহাতেও সন্দেহ নাই। এই জন্যই আচার্য্যের পক্ষে কতকগুলি অপরিহার্য্য প্রাথমিক গুণ থাকা আবশ্যক। সেগুলি যাঁহার ভিতর আছে তাঁহার পক্ষে অন্যান্য জিনিষগুলি অর্জ্জন করিয়া লওয়া কঠিন হইবে না। অর্থাৎ নিজের স্বার্থের জন্য নহে, পরের জন্য যাঁহারা আপনাদিগকে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছেন, সেবার দুঃসহ দুঃখকে যাঁহারা ভয় পান না, ভোগ নহে ত্যাগেই যাঁহাদের সুখ, যাঁহারা ব্রহ্মচারী, দেশের এই গুরু কর্ত্তব্যের ভার মাথায় তুলিয়া লইবার অধিকারীও কেবলমাত্র তাঁহারাই।

শিক্ষায়তনের উপযোগী স্থান

আচার্য্যের পরেই প্রয়োজন স্থানের। যেখানে শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হইবে সে স্থানও উক্ত আদর্শের অনুকূল হওয়া চাই। বিদেশী শিক্ষা আমাদের চিত্তকে এমন ভাবেই অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে যে, মনের দিক দিয়া এবং অর্থোপার্জ্জনের দিক দিয়া এ শিক্ষার ব্যর্থতা প্রতিনিয়ত অনুভব করিয়াও আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েকে অসঙ্কোচে এই সমস্ত শিক্ষাগারেই ভিড়াইয়া দিতেছি। অন্য কোনো শিক্ষার দ্বারা যে তাহারা মানুষ হইয়া উঠিতে পারে, তাহার কল্পনা পর্য্যন্তও আমাদের অনেকের পক্ষে অসম্ভব। শিক্ষায়তন যেখানে প্রতিষ্ঠিত হইবে সেখানকার আবহাওয়াও যদি এইরূপ না হয়, তবে সেখানে শিক্ষায়তনের পক্ষে সাফল্য লাভ করাও অতিমাত্রায় কঠিন। এই জন্যই শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার স্থানটিও এরূপ হওয়া আবশ্যক যেখানে দুই চারিজন অন্ততঃ এরূপ লোক আছেন যাঁহারা দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন, বিদেশী শিক্ষাগারগুলির মোহ যাঁহাদের ভাঙ্গিয়াছে, জাতীয় শিক্ষার সার্থকতা যাঁহারা সত্য সত্যই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

বস্তুতঃ কেবলমাত্র বাহিরের লোকের সাহায্যে এ আয়তন গড়িয়া উঠিবে এ কল্পনা থাকিলে এ জিনিষ কখনো গড়িয়া উঠিবে না। আয়তনের জন্য গৃহ চাই, উদ্যম চাই, অতএব স্থানীয় লোকের ত্যাগও চাই। যে গ্রামে এগুলি পাওয়া যাইবে, স্থানীয় উৎসাহী লোক মিলিবে, যে স্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই ধরণের কার্য্যের অনুকূল হইবে সেই সকল স্থানই শিক্ষায়তনের জন্য নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক।

শিক্ষায়তনের উদ্দেশ্য

কিন্তু তাহার আগেও ভাবিয়া দেখার দরকার ইহার শিক্ষা-পদ্ধতি কিরূপ হইবে, কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করিয়া ইহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে যে শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—গ্রামবাসীর অর্থাৎ চাষীর সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। তাহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষাই দিতে হইবে যাহাতে তাহারা গ্রামে থাকিয়াই সন্তুষ্ট, মার্জ্জিত ও পূণ্য জীবন যাপন করিতে পারে, যাহাতে কৃষিকে হেয় জ্ঞান না করিয়া নিজের অর্জ্জিত বিদ্যার দ্বারা তাহারা গ্রামকেই পূর্ণ করিয়া তোলার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা লাভ করে। পাঠ্য বিষয় অবশ্য খুব বেশী থাকিবে না। অক্ষর-পরিচয়, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িতে পারার মত জ্ঞান, প্রাথমিক গণিত—সাধারণের জন্য ইহাই শিক্ষার ব্যবস্থা। যাহার বিশেষ প্রতিভা ও আকাঙ্ক্ষা দেখা যাইবে, তাহাকে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হইবে। বিদ্যার্থীদের ধর্ম্মবুদ্ধি ও বিশ্বাস জাগরিত করা এবং আচার্য্যের চরিত্রের দ্বারা সেই বিশ্বাস ও বুদ্ধি দৃঢ় করা গোড়ায় আবশ্যক বলিয়া বিদ্যার্থীদের আচার্য্যের সহিত বাস করা আবশ্যক।

একথা ঠিক যে, কৃষকদের ভিতর এমন অনেক অভিভাবক পাওয়া যাইবে না যাঁহারা আয়তনে আচার্য্যের নিকট সন্তানকে রাখিতে সম্মত হইবেন। চাষীদের গৃহকার্য্যে সন্তানেরা সাহায্য করে, এ কারণেও অনেকের পক্ষে সন্তানকে আয়তনে রাখা সম্ভব হইবে না। কিন্তু আমরা সংখ্যার দিকে দৃষ্টি না দিয়া যদি গুণের দিকে দৃষ্টি রাখি তাহা

হইলে দমিয়া যাওয়ার কোনো কারণ নাই। একটি বালক যদি একটি আয়তন হইতে তৈরী হয়, তাহা হইলেও শ্রম ব্যর্থ হইবে না। আচার্য্য বিদ্যার্থীর পিতা ও সখা-স্বরূপ হইবেন। বাড়ী হইতে আসিয়া পড়িয়া যাইবে এমন বিদ্যার্থী গ্রহণ করা হইবে না। কারণ লিখন-পঠন শিক্ষা দেওয়া এ শিক্ষায়তনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়—চরিত্র ও সংস্কার গঠনই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

ব্যবহারিক শিক্ষার মধ্যে চরখাই কেন্দ্রস্থান গ্রহণ করিবে। এতদ্ব্যতীত বয়ন কার্য্য এবং আরও দুইটি একটি সহজ-সাধ্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে যাহা গ্রাম্য জীবনে কাজে লাগে। গৃহকার্য্য ত শিক্ষা দেওয়া হইবেই, হাল-চালনাও শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহার জন্য গ্রামের উপযুক্ত লোকের সাহায্য লওয়া হইবে। আচার্য্য নিজেও শিক্ষা করিবেন যেন পরে তিনি একজন আদর্শ চাষী হইতে পারেন। চাষীর ছেলেকে চাষী হওয়ার উপযুক্ত সমস্ত শিক্ষা ও সুযোগ দেওয়া হইবে। উপরন্তু সৎ চিন্তার শক্তি উদ্‌বুদ্ধ করিয়া যাহাতে স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও উদারতায় গ্রাম্য জীবন পরিপূর্ণ হয় তাহারই খোরাক বিদ্যার্থী আয়তনে থাকিয়া সঞ্চয় করিবে। সম্ভব হইলে আয়তনের সংলগ্ন ক্ষেত্র, গোশালা, ফল-ফুল ও শাক-সব্জি প্রভৃতির বাগিচা থাকিবে।

যে গ্রামে আয়তন প্রতিষ্ঠিত হইবে, কালক্রমে সেই গ্রামের সকলেই যাহাতে বস্ত্র সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হয়, কাহাকেও বস্ত্র কিনিতে না হয়, এ উদ্দেশ্যও সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাদিগকে কাজ করিতে হইবে। আচার্য্যের স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ভেদ থাকিবে না এবং বিদ্যার্থীর ভেদ-বুদ্ধি যাহাতে দূর হয় আচার্য্য তাহারও পথ অবলম্বন করিবেন।

ইউরোপের আদর্শ

ইউরোপ স্বাধীন। কিন্তু যৌবনের উন্মত্ত আবেগে সে যে পথ ধরিয়াছে সে পথ ত্যাগের পথ নহে—ভোগের পথ। তাই অজস্র পাইয়াও তাহার অতৃপ্তির হাহাকার থামিতেছে না। পরের রক্ত সে দানবের মত নিঃশেষে শোষণ করিয়া লইতেছে, কিন্তু তাহার নিজের রক্তের ভিতর যে জ্বালা জাগিয়া উঠিয়াছে সে জ্বালার দুঃখও সামান্য নহে। প্রাচুর্য্যের সিংহাসনে বসিয়াও তৃপ্তি ও আনন্দের সন্ধান তাহার মিলিতেছে না। অভাবের লাঞ্ছনা তাহার মনের ভিতর রাবণের চিতার মত যে অফুরন্ত আগুনের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মৃগতৃষ্ণিকার মত তাহাই তাহাকে ছলনা করিয়া ফিরিতেছে। বস্তুতঃ যে শিক্ষা মানুষকে ভোগের পথে পরিচালিত করে তাহার দ্বারা মানুষের জীবন কখনো আনন্দের অপূর্ব্বতায় ভরিয়া উঠিতেও পারে না।

কিন্তু বড় আদর্শ একদিন ভারতবর্ষের জীবনে একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই সত্য শিব এবং সুন্দরও সেদিন তাহার জীবনের ভিতর দিয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার জন্যও তাহাকে তপস্যা করিতে হইয়াছে। ত্যাগের সাধনায়, সেবার সাধনায়, শিক্ষার ভিতর দিয়াই সেদিন জন-গণের চিত্তকে উন্মুখ করিয়া তোলা হইত। তাই সেদিন তাহার শিক্ষার ক্ষেত্র ছিল তপোবন এবং শিক্ষার প্রথম সোপান ছিল ব্রহ্মচর্য্য। এই তপোবনে ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর সংযম, নিষ্ঠা ও বিলাসের বর্জ্জন দ্বারাই তাহাদের

মনকে গড়িয়া তোলা হইত, যাহারা উত্তরকালে সমাজের পরিচালনার ভার আপনাদের হাতে গ্রহণ করিবে।

পরাধীনতা প্রকাণ্ড দুঃখ। এ দুঃখের অভিশাপ ভারতবর্ষ একান্ত নির্ম্মম ভাবেই ভোগ করিতেছে। কিন্তু এক পরাধীনতার অপরাধেই যে তাহার দুঃখের পানপাত্র এমনভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে তাহা নহে। এই পরাধীনতার শৃঙ্খল যদি না-ও থাকিত তবু ভারতবর্ষ আজ যে পথে ছুটিয়া চলিয়াছে সে পথে চলিয়া পরিপূর্ণ আনন্দের আস্বাদ সে কখনো লাভ করিতে পারিত না।

যুগে যুগে যাহারা ত্যাগের দ্বারা, নিষ্ঠার দ্বারা, সংযমের দ্বারা জাতীয় জীবনকে উন্নত করে, পুষ্ট করে, ভারতবর্ষের সেই যুবক শক্তিই আজ পথ-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার মোহে আজ তাহারা মুগ্ধ। বিলাস এবং স্বার্থের নাগপাশ তাহাদিগকে চারিপাশ হইতে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। যাহা শুভ এবং ধ্রুব এমনি করিয়াই ভারতবর্ষ তাহার আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত। এই জন্যই ভারতের গ্রামে গ্রামে আজ ভারতের নিজের আদর্শে আবার শিক্ষায়তন গড়িয়া তোলা দরকার। কারণ পথ-ভ্রষ্ট ভারতবাসীকে ভারতের যাহা আদর্শ, কেবল মাত্র সেই আদর্শের শিক্ষাই সত্যকার পথের সন্ধান বলিয়া দিতে পারে।

শিক্ষিতের ব্যর্থতা কোথায়

যে পথে শিক্ষিত যুবকগণ চলিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের নিজেদের ও দেশের সর্ব্বাঙ্গীন হিত হইতেছে না। অনেক যুবক জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা কি করিবেন। বাস্তবিক, কি করিবেন একথা বুঝানো বড় শক্ত। কেন না যাহা করা দরকার তাহা যুবকেরা করিতে চাহেন না। তাহা হইতেছে—ত্যাগের দ্বারা ভোগ করার কথা।

যে শিক্ষা-পদ্ধতি পাঠশালা ও স্কুলে প্রচলিত আছে, যাহার ভিতর দিয়া উচ্চ শিক্ষিতের পথ, সে পদ্ধতি ছাত্র-সমাজকে বিচ্ছিন্ন হইতেই শিক্ষা দেয়। লেখাপড়া শিখিয়া গাড়ী-ঘোড়া চড়া যায় এই কথাটা একটা বড় রকমের সত্য বলিয়া বর্ণ-পরিচয় হইতে ছেলেরা শেখে। তারপর ভারি ভারি পরীক্ষায় পাশ করিয়া বড় বড় বেতন পাওয়াই তাহাদের আদর্শ হয়। মাঝে মাঝে দুই একজন মেধাবী ছাত্রকে ডি-এস-সি বা পি-এইচ-ডি হইয়া, অথবা বিলাত হইতে আরো কিছু পাঠ করিয়া আসিয়া মাসিক হাজার বারোশত টাকা উপার্জ্জন করিতে দেখা যায় বলিয়া শিক্ষিত সমাজ স্বভাবতঃ সেই দিকেই উন্মুখ হইয়া আছেন। ইহাতেই মস্তিষ্কের অপব্যবহারের বীজ উপ্ত হয়, জীবন ব্যর্থতায় পূর্ণ হইয়া উঠে। যে দেশের এক চতুর্থাংশ লোক এক বেলা আহার করিতে পায়, যে দেশে সাধারণের আয় গড়ে মাসিক ৩৲ বা

৪৲ টাকা, সে দেশের শিক্ষিতের কর্ত্তব্য যে কি তাহা কি শিক্ষিতকেও শুনাইতে হইবে? সে শিক্ষা কি প্রকার শিক্ষা যাহা এই নিরন্নের দেশে সাধারণের সহিত মিশিয়া সেই ৩৲। ৪৲ টাকা গড় আয়ের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে শিখায় না? সত্যকার শিক্ষা দেশকে আত্মবৎ গণ্য করিতেই শিখাইবে। দেশকে নিজের পরিবারের মত শিক্ষিতেরা যদি জ্ঞান না করিবেন তবে আর কে করিবে? দেশের গড় আয় যদি মাথা-পিছু মাসিক ৪৲ টাকা হয়, তবে শিক্ষিত'ও নিজেকে সেই পরিবারের একজন মনে করিয়া, নিজের জীবন-যাত্রার ব্যয় উহারই কাছাকাছি রাখিতে চেষ্টা করিবেন। যদি তাহা না করেন তবে স্বার্থান্বেষী হইয়া নিজের পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন। বস্তুতঃ অর্থের মোহই শিক্ষিতকে নষ্ট করিতেছে।

যাঁহাদের হাতে অর্থ আছে তাঁহারা তাহা অবাধে ব্যয় করিয়া ভোগ বৃত্তি চরিতার্থ করিতেছেন। ভদ্র সম্প্রদায় আজ তাঁহারা নহেন যাহারা চরিত্রবলে উন্নত, ভদ্র সম্প্রদায় মানে যাহারা হাতে কাজ করা ছাড়িয়া দিয়াছেন। ভদ্রেরাই শিক্ষিত। তাঁহারাই গৃহ-কর্ম্মের জন্য দাস-দাসী রাখার মত যথেষ্ট উপার্জ্জন করিবেন এবং যত অল্প কায়িক শ্রমে যত অধিক উপার্জ্জন করা যায় সেই কৌশল আয়ত্ব করিবেন। ভদ্রগণ নিজেরা এই কৌশল আবিষ্কার করিয়া বেড়াইতেছেন ও সন্তান-সন্ততি যাহাতে এই কৌশল সহজে আবিষ্কার করিতে পারে তাহার জন্য তাহাদিগকে স্কুল-কলেজে, টেক্‌নিক্যাল প্রতিষ্ঠানে ও বিলাতে পাঠাইতেছেন। চাষীদের মধ্যেও এই ধারা সুরু হইয়াছে। তাহারাও স্কুল-কলেজে পড়িয়া তথাকথিত শিক্ষার পর কায়িক শ্রমের পথ ত্যাগ

করিয়া ভদ্র-শ্রেণীভুক্ত হইতেছেন। সমাজে ভদ্র শিক্ষিতের বোঝা বাড়িয়াই চলিতেছে। যিনি স্বার্থান্বেষণে ছুটিয়াছেন ও কায়িক শ্রমের অমর্য্যাদা করা শিক্ষা করিয়াছেন তিনিও শিক্ষিত! এরূপ অবস্থায় মস্তিষ্কের অপব্যবহার হইবে না ত কি হইবে?

শিক্ষার জন্য পূর্ব্বে সন্তানকে গুরু-গৃহে পাঠানো হইত। শিক্ষা-কালেও গুরু-ছাত্রে আদান-প্রদান হইত। ছাত্র শিক্ষা গ্রহণ করিত এবং সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থালীর কার্য্য করিত। শিক্ষা শেষ হইলে ছেলের চরিত্র গঠিত হইবে, সমাজকে অলঙ্কৃত করিবে, এই থাকিত পিতামাতার বাসনা। কিন্তু আজ শিক্ষা দ্বারা চরিত্র গঠিত হইবে, জ্ঞান পাইবে—এমন আশায় ছেলেকে স্কুলে পাঠানো হয় না। পাঠানো হয় যাহাতে তাহারা সহজে টাকা রোজগারের কলটা শিখিয়া লইতে পারে সেই জন্য। সেই কৌশলটী হয়ত কেহ শেখে, আর অধিকাংশই সেই কলের পিঁজরায় বদ্ধ হইয়া হাত-পা খাটাইয়া উপার্জ্জন করাকে—দেশের ৯০ জনের একজন হওয়াকে অর্থাৎ চাষা মজুর শিল্পী হওয়াকেই অবজ্ঞা করে।

শ্রম-বিভাগের আবশ্যকতা স্বীকার দ্বারাও শিক্ষিত ভদ্রদের আচরণ সমর্থন করা যায় না; শ্রম-বিভাগে কিছু লওয়া ও কিছু দেওয়ার কথা। কিন্তু আজ অর্থের প্রাধান্য বশতঃ শ্রম-বিভাগের ভিত্তিগত আদান-প্রদান ক্রিয়াশীল নহে। অর্থ থাকিলে কায়িক শ্রম না দিয়াও কেবলি লওয়া যায় এবং তাহাতে লজ্জা বোধ হয় না। শিক্ষিত ভদ্র যুবক যাঁহার শরীরে সামর্থ্য আছে, যাঁহার সময় আছে, তিনি বাজারে গিয়া এক ঝুড়ি তরকারী কিনিলে স্বভাবতঃই একজন

মজুর দ্বারা বহন করাইবেন। মজুর তাঁহার অপেক্ষা দুর্ব্বল হইতে পারে, বৃদ্ধ হইতে পারে, সে সকল কথা চিন্তায় আসিবে না। তাহাকে দিয়া বহন করাইতে লজ্জা বোধ হইবে না, বরঞ্চ নিজে বহন করিতেই লজ্জা বোধ হইবে। বাস্তবিক কায়িক শ্রম করিতে লজ্জা বোধ করাই ভদ্র শিক্ষিতের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়াছে; এবং এই বোধ দেশের ৯০ জন হইতে শিক্ষিতকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

চাষী ও শিল্পীরাই সত্যকার উৎপাদক। চাষী ভূমি কর্ষণ করিয়া, শিল্পী হাতে পায়ে শ্রম করিয়া দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিতেছে। মজুর ও বণিক তাহাকে উৎপাদন ও বিতরণের প্রতি স্তরে সাহায্য করিতেছে। ভদ্রের যদি সেই পণ্য ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে চাষী শ্রমিক মজুর বণিকের মধ্যে যে আদান-প্রদান সূত্রে গোষ্ঠী হইয়াছে তাঁহাদেরও তাহারই অন্তর্ভুক্ত হওয়া সঙ্গত। পূর্ব্বে যে আচার্য্যেরা শিক্ষা দিতেন তাহার জন্য সমাজ তাঁহাদের অন্ন যোগাইত। তাঁহাদের চাষ করিতে, কাপড় বুনিতে ও গাছ কাটিয়া লাকড়ি করিতে হইত না। যাহারা ঐ সকল কাজ করে তাহারা ও তাহাদের সন্তানেরা আচার্য্যের নিকট হইতে উপদেশ ও শিক্ষা পাইত। তাহার বিনিময়েই আচার্য্যের ভরণ-পোষণ চলিত। কিন্তু আজ ভদ্রের জন্য আদান মাত্র আছে, প্রদান নাই।

আজ ভদ্রের সেবা কদাচিৎ চাষীর নিকট পৌঁছে। ভদ্র-সমাজ শিক্ষকতা করিতেছেন সত্য, কিন্তু সে শিক্ষা ভদ্রশ্রেণীরই উপযোগী। চাষী সে শিক্ষা লইতে পারে না—লইলেও সদ্য সদ্য নিপাতে যাইবে।

যে ভদ্র শিক্ষিত চিকিৎসক হইয়াছেন, তাঁহার চিকিৎসার গণ্ডীও প্রধানতঃ স্বশ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ। না তাহা চাষীর উপযোগী, না তাহা চাষীর সামর্থ্যের মধ্যে। ভদ্রেরা নিজেদের সুবিধার জন্য নিজেদের মধ্যে এক প্রকার শ্রম-বিভাগ করিয়া লইয়াছেন। উকীল, মাষ্টার, কেরাণী, ডাক্তারে আদান-প্রদানের যোগ আছে এবং ইঁহারা সকলে মজুর, চাষী ও শিল্পী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়াছেন।

এ দেশে এমনটা ছিল না। এমন হইয়াছে ইংরাজের সমাজের অনুকরণে। ইংরাজ নিজের দেশে চাষী হইতে ভদ্রকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। ইংরাজদের দেশে পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে এক জাতীয় প্রাণীই মনুষ্য পদ বাচ্য হ'ন—সে প্রাণীর নাম gentleman বা ভদ্রলোক। সেই জাতীয় জীবই সে দেশে সাধারণকে সর্ব্ব অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজের স্বার্থকে পুষ্ট করিয়া আসিতেছে। Common বা সাধারণ কথাটা বাক্যে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে যে ভূমি সর্ব্ব সাধারণের ব্যবহারের ভূমি ছিল, ভদ্রগণ কৌশলে তাহা হইতে সাধারণকে বঞ্চিত করিয়াছেন। যে ব্যবস্থাপক সভায় সাধারণের নামে কাজ হয় অর্থাৎ যাহা House of Commons তাহা সাধারণ বা Common শ্রেণীর পক্ষে অবশ্যই রুদ্ধ। সমস্ত ইলেক্শন-প্রথা সাধারণের প্রবেশ পথের বিরোধী। Commons-এ প্রবেশ করা যখনই ভদ্রের শ্লাঘ্য হইয়াছে, মান-মর্য্যাদার মাপে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে অমনি সে স্থান হইতে Commons-এর অন্তর্হিত হওয়াও অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজের ছাপে তৈরী এ দেশের ব্যবস্থাপক সভাও

ভদ্রের মর্য্যাদা প্রাপ্তি ও ভোগের স্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছে। অধিক কি ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কার আমাদিগকে এমনি অন্ধ করিয়াছে যে, যাহা আমাদের একেবারে নিজস্ব সংস্থা, যাহা দেশের আপামর সাধারণের শক্তিতে পুষ্ট হইয়া দেশকে রাজনৈতিক মুক্তির পথে পরিচালিত করিবার জন্য গঠিত, সেই কংগ্রেসও আমরা ভদ্রেরই গণ্ডীতে বিশেষ করিয়া বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি। ভদ্রের মধ্যেও যাহারা অর্থ-সম্পদে অধিকতর ভদ্র, কংগ্রেস তাঁহাদেরই করতলে স্বাভাবিক প্রগতিতে আসিয়া বিকৃত ও শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। বিলাতী সর্ব্বনাশকারী সংস্কার এমনি করিয়া মায়াজালে আমাদের শিক্ষিতের সর্ব্ব প্রচেষ্টা গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে, সত্যকার শুভ হইতে বঞ্চিত করিতেছে। শিক্ষিত তিনিই যিনি নিজের কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যথোপযুক্ত ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু এ শিক্ষা ভদ্র সন্তানেরা পাইতেছেন না। ইংরাজের গঠিত শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে এ শিক্ষা পাওয়ার কোন সম্ভাবনাও নাই। তাই আজকাল শিক্ষিত যুবকের মন যখন সাধারণের সেবা করিবার জন্য চঞ্চল হয় তখন ঠিক পথ খুঁজিয়া পায় না। আজ সাধারণের উপকার করার মানে গ্রামে গিয়া নৈশ বিদ্যালয়, পাঠশালা বা পাঠাগার স্থাপন করা। কিন্তু নৈশ বিদ্যালয়াদি সাধারণকে কি দিবে? যে জ্ঞান উহা হইতে ভদ্রেরা পাইতেছেন তাহা অজ্ঞান বা মিথ্যা জ্ঞান। ভদ্র-সমাজ তাহাতে নষ্ট হইতেছে। সে দ্রব্য চাষীকে বিতরণ করিয়া কি হইবে? যদি চাষী তাহা গ্রহণ করে তবে তাহাতে ত দেশের অমঙ্গলই বাড়িবে মাত্র।

আজকাল শিক্ষিত যুবক যদি দেশকে কিছু দিতে চা'ন, তবে সে

যোগ্যতা পূর্ব্বে অর্জ্জন করিতে হইবে। চাষীকে মর্য্যাদা করিতে শিক্ষা করা প্রথমে দরকার। তাহাদিগকে কৃপার পাত্র মনে না করিয়া, তাহারা ভদ্র অপেক্ষা অধিকতর অবিকৃত আছে, সৎ আছে, কর্ম্মঠ আছে এবং সেই জন্য তাহারা নিজ ক্ষেত্রে ভদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই ধারণা লইয়া তাহাদের নিকট অগ্রসর হইতে হইবে। যো 'যঃ শ্রদ্ধঃ স এব সঃ।'—'যিনি যাহাকে শ্রদ্ধা করেন তিনি তাই হ'ন।' চাষীর প্রতি যদি অনুকম্পা না আসিয়া শ্রদ্ধা আসে, তবে তাহার অভিব্যক্তিতে নিজের ভিতরেও কায়িক শ্রমের জন্য মর্য্যাদা জ্ঞান ফুটিয়া উঠিবে। ঈশ্বর যে কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি দিয়াছেন তাহার ব্যবহার দ্বারা নিজের প্রাথমিক অভাব-গুলি নিজেই মিটাইবার গৌরব আগে অনুভব করিতে হইবে। চাষ করা বা বস্ত্র বয়ন করা মর্য্যাদার কার্য্য ; ওকালতী, মাষ্টারী, ডাক্তারী ও কেরাণীগিরি অপেক্ষা তাহা অমর্য্যাদার নহে, কর্ম্মের ভিতর দিয়া জীবনে এই ভাব সত্য করিয়া লইলেই তবে সাধারণের সেবার অধিকার জন্মিবে। শ্রমিক ও চাষার হিতের জন্য সভা করিলে এবং জেলে গেলেও সে সম্প্রদায়ের সত্যকার হিত করার সামর্থ্য ততদিন হইবে না, যতদিন না জীবনে ও আচরণে চাষীর মজুরের শিল্পীর কার্য্যে মর্য্যাদা-বোধ ফুটিয়া উঠে। এ কথাটা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভদ্রেরা হাতের কাজ বা শ্রমের কাজ করাকে অবজ্ঞা করিয়া অনায়াসে বা অল্পায়াসে ভোগসুখ পাওয়া শ্লাঘ্য বিবেচনায় সেই পথই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভদ্রের দেখাদেখি চাষা ও মজুরেরাও শ্রমের মর্য্যাদা জ্ঞান হারাইতেছে। ব্যাধি এইখানে। শিক্ষিতের জীবনকে সার্থক করিতে হইলে এই ব্যাধিরই চিকিৎসা করিতে হইবে।

ভদ্র পরিবারের ভিতর কন্যারা এতদিন শ্রমের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। বিলাতী উন্মত্ততার তরঙ্গ সে স্থানেও ভাঙ্গন ধরাইয়াছে। ইহা অবশ্যম্ভাবী। পুরুষেরা দীর্ঘদিন অন্যায় আচরণ করিলে মেয়েদের ভিতরেও যে সেই অন্যায় সংক্রামিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহারাও আজ আর পরিবারে মায়ের স্থান, গৃহিণীর স্থানের গৌরবটা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। অল্প খাটিয়া বা না খাটিয়া ভোগ করিবার ইচ্ছা ও তজ্জাত চাঞ্চল্য স্ত্রীলোকদের মধ্যেও স্পষ্ট হইতেছে। সন্তান ধারণে অনিচ্ছা, সন্তান পালনে অনিচ্ছা, পরন্তু ভোগ-পরায়ণা হওয়ার ইচ্ছা তাঁহাদের ভিতরেও দেখা দিয়াছে।

ঘরে বাহিরে এমনি করিয়া একটা সম্প্রদায়ের মস্তিষ্কের অপব্যবহার হইতেছে—শিক্ষা ব্যর্থ হইতেছে। শিক্ষিত যুবক যদি সত্যই নিজের ও দেশের হিত আকাঙ্ক্ষা করেন, তবে বিলাতী ভোগময় সংস্কার পরিহার করিয়া দেশের ও দশের সহিত এক হইবার সাধনা গ্রহণ করিবেন। যাঁহাদের মনে আধুনিক ভদ্র-সমাজের ব্যর্থতার প্রতি বিতৃষ্ণার উদয় হইবে, যাঁহারা জীবন-ধারণের জন্য অপরকে পীড়ন করিতে ক্লেশ অনুভব করিবেন, তাঁহাদিগকে দেশের জন-সাধারণের একজন হওয়ার সাধনাই গ্রহণ করিতে হইবে।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর কত বড় শক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে! যে দিকেই এই সম্প্রদায় বড় হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন সেই দিকেই সাধনার দ্বারা কাম্য অর্জ্জন করিয়াছেন। শিক্ষিতগণের অধিকাংশ যদি সত্যই মুক্তি কামনা করিতেন, যদি সত্যই জন-সাধারণের সহিত একত্ব অনুভব করিবার

ইচ্ছা করিতেন, তবে তাঁহাদের কিছুই অপ্রাপ্য ছিল না—নিজ শক্তিতে সমস্তই অর্জ্জন করিয়া লইতেন। দেশ-জননীকে ভক্তি করা গুরু কর্ত্তব্য। জননীর অন্য সন্তানের সহিত একত্ব অনুভব করা এই ভক্তির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ৯০টী ভাইকে পৃথক রাখিয়া দশটী ভাই মায়ের পূজা করিলে মায়ের মনে আনন্দ কোথায়? এ মায়ের পূজা বিশেষ মাসে ও তিথিতে হয় না—ভক্তের হৃদয়ে অনুক্ষণ মায়ের পূজা চলে। শিক্ষিত যুবকগণ খাঁটি মাতৃভক্ত হইলে, অনুক্ষণ মায়ের সকল সন্তানের সহিত একত্ব অনুভব করিলে, সমস্ত ব্যর্থতা দূর হইবে।

প্রজার হিত

প্রজার হিত কল্পনার সহিত জমিদারের স্বার্থের বিরোধের কল্পনা যুক্ত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এই কল্পনার গোড়ায় কি আছে? জমিদার প্রজার প্রতিপোষণ ও পালন করার কর্ত্তব্য করেন না—ইহা কোনও অভিযোগের ভিত্তি হইতে পারে না। জমিদার আজ-কালকার রাজকীয় ব্যবস্থায় ট্যাক্স-দারোগা মাত্র, গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রজার খাজনা পঁহুছিয়া দিবার জন্য জমিদার মধ্যস্থ ব্যক্তি মাত্র। তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহা হইতেছে খাজনা আদায় করা—নির্দ্ধারিত খাজনা নির্দ্ধারিত সময়ে আদায় করা ও নিজের কমিশন রাখিয়া বাকীটা সরকারী ট্রেজারীতে বা ধনকোষে পঁহুছাইয়া দেওয়া। যিনি অন্যায় করিয়া খাজনা আদায় করেন—পীড়ন পূর্ব্বক প্রজাকে অধিক অর্থ দিতে বা কায়িক শ্রম দিতে বাধ্য করেন তিনি অত্যাচারী। তাঁহার অত্যাচার ধরা-ছোঁয়া যায়—বন্ধ করাও যায়। কিন্তু যাঁহাদের উপর সাধারণ ভাবে কর্ত্তব্যহীনতার দাবী দিয়া দোষারোপ করা হয়—যাঁহারা সহরে থাকিয়া পল্লীর প্রজার খাজনা আদায়লব্ধ ব্যবসায়ে পুষ্ট হ'ন মাত্র তাঁহাদের উপর দোষারোপ করার অবকাশ কোথাও নাই। তাঁহাদের বড় অপরাধ এই মাত্র যে, তাঁহারা প্রজার নিকট হইতে যাহা লইতেছেন তাহার বিনিময়ে প্রজাকে কিছুই দিতেছেন না। কিন্তু জমিদারের কর্ত্তব্য ত প্রজার প্রতি নহে—জমিদারের কর্ত্তব্য খাজনা আদায় করা ও পহুঁছাইয়া দেওয়া। সেই কর্ত্তব্য যদি তাঁহারা সাধারণ সততার সহিত সম্পন্ন করেন তবেই

তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যপরায়ণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে মন মানে না—সংস্কারে আঘাত লাগে। প্রজার প্রতি জমিদারের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সংস্কার রহিয়া গিয়াছে। তাহার মূলে এই আছে যে, যাহা লওয়া হয় তাহার উপযুক্ত প্রতিদানের কর্ত্তব্যও একটা থাকিয়া যায়। কিন্তু লওয়ার বিনিময়ে দেওয়া আজ-কালকার আচারে ত অবশ্য-করণীয় নহে। সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনীতি ইহার ব্যত্যয় মানিয়া লইয়াছে। জমিদারের একার হাতে পুঞ্জীভূত অর্থ আসে বলিয়া চোখে পড়ে, বিশেষতঃ জমিদার মহাশয়ের স্বচ্ছল অবস্থা, তাঁহার ভোগ করিবার ক্ষমতা ও সমাজে তাঁহার শ্রেষ্ঠ আসন আছে বলিয়াই তাঁহার কার্য্য সমালোচনার বিষয় হয় ও বিরোধের উদ্রেক করে। কিন্তু আর একটু নিম্নস্তরে দেখা যাউক—যিনি জমিদারকে খাজনা দেন, জমি রাখেন ও ভাগে জমি চাষ করেন তিনি কি করিতেছেন?

এই শেষোক্ত মহাশয় সাধারণ প্রজারই মত দশের এক হইয়া মিশিয়া আছেন, ইনি বাংলার মধ্যবিত্ত ভদ্র-সম্প্রদায়ভুক্ত। যাঁহারা জমিদারের সমালোচক তাঁহারাও এই সম্প্রদায়ভুক্ত, কাজেই এই সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসু ও বিরোধী-দৃষ্টি পড়ে না। চাষার সহিত এই ভাগীদার-মালিকের সম্পর্ক বিবেচনা করা যাউক। ভাগীদার মহাশয় জমিদারকে বিঘা প্রতি ২৲ টাকা হইতে জমি বিশেষে ৪৲ টাকা খাজনা দিয়া খালাস। তারপর কৃষককে সেই জমি ভাগে বিলি করা হয়। ব্যবস্থা এই যে, কৃষক বীজ ক্রয় করিবে, চাষ করিবে, শ্রম করিয়া ফসল উৎপন্ন করিবে, তারপর সমস্ত ফসলের অর্দ্ধেক ভাগীদার মহাশয়ের বাড়ীতে পহুঁছিয়া দিবে। এক বিঘা জমিতে যদি ৩০৲ টাকার ধান

উৎপন্ন হয় ও ১০৲ টাকার খড় উৎপন্ন হয়, তবে যে কৃষক চাষ করিবে তাহার ঘরে থাকিবে ইহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ ২০৲ কুড়ি টাকা ও যে ঘরে বসিয়া জমি বিলি করিয়াছে সে ব্যক্তি বিনা শ্রমে ২০৲ টাকা হইতে জমিদারের খাজনা ৪৲ টাকা বাদ দিয়া ১৬৲ টাকা লাভ করিবে।

জমিদার যে ভূমিখণ্ড হইতে ৪৲ টাকা পাইতেছেন তাহা হইতে খাজনা আদায় করার খরচা ১৲ টাকা বাদ দিয়া ৩৲ টাকা লাভ করিতেছেন, কিন্তু সেই ভূমিখণ্ড হইতেই ভাগীদার মহাশয় ১৬৲ টাকা লাভ উঠাইতেছেন! যদি জমিদারের প্রজার প্রতি তিন আনা কর্ত্তব্য করিতে হয়, তবে ভাগীদারের কর্ত্তব্যের অংশ পড়ে ষোল আনা। কাজেই প্রজাকে প্রতিদান না দিয়া খাজনা লইবার জন্য জমিদারকে অভিযোগ করিবার পূর্ব্বে এই ভগীদারকে খুঁজিয়া বাহির করা দরকার। আর এই ভাগীদার বাংলার ভদ্র-সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়টি ভাগীদাররূপে যেমন পুষ্ট তেমনি ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হইতেছে। যে কৃষকের অবস্থা ভাল সে ক্রমশঃ নিজে যত চাষ করিতে পারে তাহার অধিক জমি গ্রহণ করিয়া ভাগীদার দ্বারা চাষ করাইতেছে। এই উপায়ে জন-মজুর ও কৃষকের শ্রমে ধন বর্দ্ধিত হইতেছে এবং কৃষকদের ছেলেরা চাষের কাজ ছাড়িয়া স্কুলে ও কলেজে প্রবেশ করিতেছে এবং অল্পকাল মধ্যেই ভদ্র-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতেছে।

একজন খ্যাতনামা মাড়োয়ারী আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেন যে, রাজপুতানা ও মাড়োয়াড়ের ভূমি অনুর্ব্বর, জল পাওয়া দুষ্কর, চাষ কষ্ট-সাধ্য এবং খুব কম লাভজনক, আর বাংলার ভূমি উর্ব্বর, ফসলও

প্রচুর হয়; এদিকে মাড়োয়াড়ের মাঠে দেখুন এই অনুর্ব্বরতার উপর পুষ্ট কৃষকের পায়ে জুতা, গায়ে পিরান্ ও মাথায় পাগ্ড়ী আছে; আর বাংলার কৃষকের পায় জুতা নাই, গায় জামা নাই—নিতান্তই দরিদ্র; ইহার হেতু কি? অনুর্ব্বর ভূমির কৃষক উর্ব্বর ভূমির কৃষক অপেক্ষা স্বচ্ছল কেন? সেখানে রাজার খাজনা ও অত্যাচারও বেশী। তথাপি তুলনায় বাংলার কৃষক অধিকতর বিপন্ন ঋণগ্রস্ত ও অসহায়। অথচ এই বাংলার কৃষক পাট উৎপন্ন করিতেছে, যে পাটের ব্যবসার উপর কলিকাতার ঐশ্বর্য্যের অনেকখানি নির্ভর করে। তিনি বলেন যে, তিনি এই প্রশ্ন অনেককে করিয়াছেন, বাঙ্গালী অর্থশাস্ত্রবিদ্‌কেও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর পা'ন নাই। ইহার উত্তর আমার নিকট সুস্পষ্ট। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহাদের দেশে কি বাংলার মত ভদ্র-সম্প্রদায় কৃষকের অর্থে পুষ্ট হইতেছে? তিনি বলেন যে—না, সেখানে বাংলার ন্যায় ভদ্র-সম্প্রদায় নাই—কৃষক ও জমিদার বা রাজার মাঝামাঝি এমন একটা বিরাট সম্প্রদায় নাই। তাঁহার সমস্যার সমাধান এইখানে। বাংলার বিশাল ও ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধমান ভদ্র সম্প্রদায়ের প্রয়োজন যোগাইতেই বাংলার চাষা অস্থি-চর্ম্ম-সার ব্যাধি-পীড়িত ও নিষ্পিষ্ট। বাংলার ভদ্র সম্প্রদায়ও কিছু স্বাচ্ছন্দ্যে নাই—তাহারা রোগক্লিষ্ট পীড়িত ও নিরন্ন। কিন্তু তাহা অবশ্যম্ভাবী। বসিয়া ভোগ করিবার চেষ্টা যেখানে, অল্প আয়াসে অধিক উপার্জ্জনের ব্যবস্থা যেখানে, সেইখানেই সম-পরিমাণ দুঃখ অপরের উপর বর্ষিত হইবে। মুষ্টিমেয় ইংরাজেরা ধন-সম্পদের চূড়ান্ত ভোগ করিতেছে, তজ্জন্য সারা ভারত দৈন্য-পীড়িত। তেমনি সেই পীড়ার সহায়ক ভদ্র-সম্প্রদায়ের

মধ্যে দুই দশজন প্রচুর অর্থে ও ভোগে পুষ্ট, আর বাকী সম্প্রদায় ও কৃষক নিপীড়িত।

কৃষকের আর্থিক দুর্দ্দশায় যাঁহারা ব্যথিত তাঁহাদের এই দিকেই দৃষ্টি দেওয়া দরকার। জমিদারের উপর নিষ্ফল আক্রোশ প্রকাশ করিলে ভদ্র-সম্প্রদায়ের পাপ আরও বর্দ্ধিত হইবে, কৃষকের ও জমিদারের কাহারও শুভ হইবে না। কেহ কেহ বলিবেন যে, আমরা ভদ্র-সম্প্রদায় ও জমিদার দুইয়ের এককেও চাহি না—কেবল কৃষক ও মজুর-সম্প্রদায় থাকুক, বাকী সমস্তই ধ্বংস হউক। ইহা রাশিয়ার বিপ্লববাদের প্রতিধ্বনি—চীনের সংশয়-কুজ্ঝটিকার অন্তরালস্থ মর্ম্মন্তুদ গর্জ্জন। কিন্তু এই বিপ্লব জগৎকে সুখী করিতে পারিবে না। কৃষক হইতেই বৈশ্য সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইবে—আবার তাহা হইতেই ভদ্র-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইবে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইবে। সামাজিক প্রয়োজনেই ইহার উদ্ভব। মনুষ্য চরিত্র একেবারে বদলাইয়া না ফেলিলে এই সম্প্রদায়-বিভাগ রোধ করা অসম্ভব। মনুষ্য চরিত্রের অন্তরালেই ইহার মূল রহিয়াছে। ভগবান সকল মানুষকে সমান করিয়া গড়েন নাই—বুদ্ধি ও কৌশলের পার্থক্য রহিয়াছে। বোলশেভিকি ষ্টীম-রোলারের দ্বারা ভগবান-সৃষ্ট এই পার্থক্য নাশ করার চেষ্টা বৃথা—সমূহ অমঙ্গলের কারণ স্বরূপ। আসল পথ হইতেছে, এই পার্থক্য মানিয়া তাহাকে সামাজিক শুভের জন্য নিয়োগ করা। ভারতীয়েরা তাহা জানিতেন, তাঁহারা বর্ণানুক্রমিক উপার্জ্জনের পন্থা অবলম্বন করিয়া একটা বিষম সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন—অসাম্যের মধ্যে সাম্য আনয়ন করিয়াছিলেন। এই সমস্যা সমাধানের উপায় ভদ্র-সম্প্রদায় নষ্ট করা নহে—ভদ্র-সম্প্রদায়ের মন

হিতের পথে নিয়োজিত করা। এই প্রকার নিয়োগের চাবি-কাঠি রহিয়াছে উপনিষদের বাক্যে—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথাঃ'—'তাঁহারা ত্যাগ দ্বারাই ভোগ করিতেন।' আজ কৃষকের দুঃখ দূর করিতে হইলে ভদ্র সমাজের ত্যাগ দ্বারাই ভোগ করার প্রেমময় ও মঙ্গলময় পথ গ্রহণ করিতে হইবে। ভদ্র-সম্প্রদায় কৃষকের নিকট হইতে এতদিন গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন—অন্যায় করিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। ভদ্র তাঁহার বুদ্ধি মার্জ্জিত করিবার—চিন্তা একাভিমুখী করিবার শিক্ষা পাইয়াছেন। সেই শিক্ষাই তাঁহাকে হিতের পথ দেখাইয়া দিবে। তাঁহাকে দেওয়ার ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। বিরোধ নহে, সংঘাত নহে, প্রেমের দ্বারা সংস্কার সাধিত হইবে—কৃষকের দুঃখ ঘুচিবে, জগতের নিপীড়িতের পীড়ার অন্ত হইবে। ভদ্রের এই ত্যাগ—এই দান কৃষককেই দেওয়া হইবে না—'সবাই যাঁকে সব দিতেছে' তাঁহাকেই দেওয়া হইবে।

সমাজে ভদ্রেরও প্রয়োজন আছে, রাজা-জমিদারেরও প্রয়োজন আছে এবং এই প্রকার ধন-বিভাগ, বিত্ত-বিভাগ এবং গুণ-বিভাগ থাকা সত্ত্বেও সমাজের সুখী ও শান্তিপূর্ণ হওয়ার পথ আছে।

পশুবল

পশুবলের আড়ম্বর আজ জগৎময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হিত করিবার চেষ্টা যেখানে সেখানেও বলপূর্ব্বক হিত করিবার উপায়ই সহজ উপায় বলিয়া সকল জাতিই সেই পথ মানিয়া লইতেছে। ইহার প্রভাব কি ভাবে জীবনের সমস্ত স্তরে কার্য্য করিয়া মানুষকে বর্ব্বরতার দিকে টানিয়া লইতেছে, আধুনিক রাষ্ট্র-চালকগণ সে বিষয়ে অন্ধ। ভারতবর্ষও আজ ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। তাই বল-দৃপ্ত আমলা-তন্ত্রের শাসনে আজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামীদেরও লাঞ্ছনার শেষ নাই। বন্দীদের দুর্দ্দশার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী আজ সকলের নিকটেই সুপরিচিত। ইহাতে বিস্মিত হইবারও কারণ নাই। এমন না করিলে বৈরাজ্য রক্ষা করা চলে না। কিন্তু পশুবল যে কেবল মাত্র বৈরাজ্যেরই বিশেষত্ব এমন নহে। স্বাধীন দেশগুলিকেও আজ পশুবলই শাসন করিতেছে। যেখানেই বল-দৃপ্ত শাসন প্রচলিত সেই খানেই ষ্টেট্ একই ধাঁচের। সেখানে নামে যে তন্ত্রই চলুক, প্রজা-তন্ত্র, মজুর-তন্ত্র বা রাজ-তন্ত্র, যাহাই বলা হউক, কাজে বল-তন্ত্রের যে রূপ তাহাই ষ্টেট ও প্রজার ব্যবহার সম্পর্কে প্রকট হইয়া পড়ে। তবে যে অত্যাচার বৈরাজ্যে অনুক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়, স্বাধীন দেশে তাহা বিশেষ ঘটনায় বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত হয়।

আমেরিকানদের দৃষ্টান্ত দেখা যাউক। যখন ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ চলিতেছিল তাহার এক অবস্থায় আমেরিকাও যুদ্ধে যোগদান করে।

যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পর আর দো-মনা হওয়া চলে না—হয় শত্রু বিনষ্ট হইবে, না হয় সে আমাদিগকে বিনষ্ট করিবে। কাজেই তখন প্রাণ-রক্ষার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। দেশের সমস্ত লোক ও ধন-সম্পদকে যাহাতে ষ্টেটের ব্যবহারে আনা যায় তজ্জন্য ষ্টেট্ সচেষ্ট হয়। এই রকম যখন অবস্থা তখন আমেরিকার কয়েকজন ধর্ম্মপরায়ণ খৃষ্টান, যাঁহারা যুদ্ধ করা অন্যায় মনে করিতেন তাঁহারা যুদ্ধে যোগ দিতে নারাজ হ'ন। তাঁহারা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প হইলেও ষ্টেটের নিকট তাঁহাদের উদাহরণের কুফল অনেকখানি। বিবেকের প্রেরণায় যাঁহারা যুদ্ধ করিতে অসম্মত, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বিবেকের ভান করিতেছেন কি না তাহার বিচার হয় এবং ৪।৫ হাজার ব্যক্তি বিবেকী বলিয়া স্থির হ'ন। তখন ইঁহাদিগকে যুদ্ধের আনুষঙ্গিক শান্তিময় কার্য্য করিবার সুযোগ দেওয়া হয়—বিশেষভাবে হাসপাতালের সেবা-কার্য্য অনুমোদন করা হয়। ইহাতে বিবেকী যুদ্ধ-বিরোধীর সংখ্যা আরো কমিয়া যায়। কেবল ৫।৭ শত ব্যক্তি যুদ্ধ-সংক্রান্ত কোনও কার্য্য করিতেই অসম্মত হন। বিপদ বাধে এই সকল লোক লইয়া। অন্য কার্য্যেও নিযুক্ত হইতে অসম্মত হওয়ায় ষ্টেট্ ইঁহাদিগকে শত্রুবৎ গণ্য করেন।

এত বড় দেশ, লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধে যোগ দিতেছে। এদিকে ধর্ম্মযাজকেরা ঘোষণা করিয়াছেন—'যুদ্ধে যোগ দেওয়াই ধর্ম্ম, আর না দেওয়া অধর্ম্ম।' পোষ্টার, লেকচার, চলচ্চিত্র ও সংবাদপত্রের সাহায্যে একটা রীতিমত রণোন্মত্ততার সৃষ্টি হইয়াছে। সমস্ত দেশটা এক মনে জার্ম্মাণীকে ঘৃণা করিতে, হিংসা করিতে ও তাহাকে শয়তান বলিয়া

গণ্য করিয়া ধ্বংস করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে। যদি জার্ম্মাণ পরাজিত না হয় তবে আমেরিকা লোপ পাইবে, সভ্যতা সত্য ও প্রেম এ সমস্তই জগত হইতে অন্তর্হিত হইবে—এমনি একটা ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। যে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক সে ভীরু, সে কৃপার পাত্র। যত বড় আবশ্যকতা বশতঃই হউক, আর বিবেকের প্রেরণাতেই হউক, যে যুদ্ধে যোগ দিতে নারাজ, লোকে তাহাকে মার্জ্জনা করিতেও নারাজ। এমনি অবস্থাতেও বল-দৃপ্ত ষ্টেট্ সামান্য সংখ্যক যুদ্ধ-বিরোধী ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করিতে পারিতেছিল না। ইচ্ছা করিলে সে ইঁহাদিগকে প্রতিপক্ষের ন্যায় গণ্য করিয়া জেলে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারিত। কিন্তু ততটুকু ঔদার্য্য বল-দৃপ্তের নাই। এত বলশালী যে ষ্টেট্, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তাহার আজ্ঞা মানিবে না—ইহা হইতেই পারে না, এই হইল ষ্টেটের পণ। 'মার্শাল-ল' অনুসারেই ইঁহাদিগকে বিচার করা স্থির হইল। হুকুম হইল ইঁহাদিগকে ড্রিল করিতে হইবে। প্যারেড ফিল্ডে এক এক জনকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইল এবং দুই-দুই জন সৈন্য দুই পার্শ্বে ধরিয়া জোর করিয়া ড্রিলের কায়দায় ইঁহাদের হাত পা চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বিবেকীরা শুইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহাদের মুখের উপর ফায়ার-বিগ্রেডের জলের সূচি-স্রোত নিক্ষেপ করা হইতে লাগিল। উহাতে শ্বাস বন্ধ হইয়া ইঁহারা একে একে অজ্ঞান হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পরে সব কয়টীকে ক্যাম্পে সেই অবস্থায় ফেলিয়া রাখা হইল। পর দিন আবার এই অভিনয়। স্থান ও মিলিটারী কর্ম্মচারীর রুচি অনুসারে এক এক দলের উপর এক এক রকম সাজা প্রদত্ত হইতেছিল।

প্রাথমিক সাজা হওয়ার পরই এক দফা কোর্টমার্শাল হয়। ফলে ৪ হইতে ২৪ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ। জেলে গেলেও তখন ইঁহারা মিলিটারী কয়েদী এবং ইঁহাদের সাজার শেষ নাই। সেখানেও মিলিটারী পোষাক পড়িয়া জেল খাটিবার আদেশ হইল। খৃষ্টের ভক্তগণ মিলিটারী পোষাক ধারণ করিবেন না। এক কয়েদীকে অন্ধকার 'সেলে' একক দাঁড় করাইয়া শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইল ও পাশে একটা সামরিক পোষাক রাখিয়া দেওয়া হইল। কয়েদী তাহা ব্যবহার করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় পুনরায় নির্য্যাতন চলিল। অসহিষ্ণু রোষের তাড়নায় যত প্রকার কুৎসিত শাস্তি কল্পনা করা যায় তাহা প্রযুক্ত হইতে লাগিল। পা দুইটা উপরের দিকে বাঁধিয়া, মাথা নীচের দিকে ঝুলাইয়া মল-মূত্রের বাল্‌তির মধ্যে মাথা প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল। তাহাতেও কয়েদী সায়েস্তা হয় না, আবার জল-চিকিৎসা আরম্ভ হইল। রাস্তায় ফেলিয়া সূচি-মুখ হইতে জল নিক্ষেপ করিতে করিতে অজ্ঞান করিয়া ভিজা বস্ত্রেই 'সেলে' বন্ধ করিয়া রাখা হইল। একজনার নিউমোনিয়া হওয়ায়, তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠানো হইল। সেখানে ঈশ্বরের কৃপায় কয়েদী দেহ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। দেহটাকে সামরিক পোষাক পরাইয়া পিতামাতার নিকট অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য ফেরৎ পাঠানো হইল।

এমন করিয়াও আমেরিকান ষ্টেট্ তাহার বিবেকী যুদ্ধ-বিরোধীদিগকে দমাইতে পারে নাই। ইঁহারা কোনও অভিযোগ না করিয়া প্রশান্ত চিত্তে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিয়া ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করিয়াছেন। পশুবল পরাজয় মানিতে চাহে না, রোষে-ক্ষোভে উন্মত্ত হইয়া উঠে।

প্রতিদ্বন্দ্বী যত ক্ষুদ্র হয় উন্মত্ততা তত বেশী হয়। সামরিক জেলের কর্ত্তা হইতে ক্ষুদ্রতম হাবিলদার পর্য্যন্ত ক্ষিপ্ত হইয়া বিদ্রোহীকে সাজা দিতে উদ্যত হয়।

এই বিবেকী যুদ্ধ-বিরোধীদিগের ধৈর্য্য ও অহিংসভাবের পরিচয়ে এই নির্য্যাতনের ইতিহাস পরিপূর্ণ। যতই নির্য্যাতিত হইয়াছেন ততই তাঁহাদের প্রসন্নতা যেন বাড়িয়াছে। একজন জেলে আছেন। তাঁহাকে এক কক্ষ হইতে অন্য নির্জ্জন কক্ষে স্থানান্তর কালে কক্ষ সাফ্ করিয়া লইতে বলা হয়। তিনি অস্বীকার করিয়া বলেন যে, যদি কক্ষান্তরে বাস করিতে হয়, তবে সে কক্ষ বাসোপযোগী করিয়া দেওয়া জেল-কর্ত্তৃপক্ষের কাজ, তাঁহার কাজ নহে। যে সার্জ্জেণ্ট এই আদেশ করিয়াছিল সে এই উত্তরে নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে। সে ক্রোধান্ধ হইয়া বন্দীকে কক্ষস্থিত একটা টুল উঠাইয়া প্রহার করিতে থাকে—মাথায়, বুকে, পিঠে মারিতে থাকে। টুল ভাঙ্গিয়া যায়, তারপর হাত দিয়া ঘুসি মারিতে থাকে। একটা ঘুসি চক্ষের উপর লাগিয়া মুষ্টি ফস্‌কাইয়া যায়। তাহাতে তাহার হাত মচ্‌কাইয়া যায়। সে যন্ত্রণায় অধীর হইয়া আর অধিক প্রহার করিতে না পারিয়া চলিয়া আসে। এই বিবেকী বন্দী এতক্ষণ চুপ করিয়া মার খাইতে খাইতে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিলেন। দৈবক্রমে অব্যাহতি পা'ন। তিনি হাত উঠান নাই, একটা কথাও বলেন নাই। সার্জ্জেণ্টটির পরে হুঁস হয় যে, কয়েদীকে মারিয়া সে বে-আইনী কাজ করিয়াছে। কয়েদীর বিচার হইয়া সাজার আদেশ পাইলে তবে উপযুক্ত দণ্ড দিবার নিয়ম। সার্জ্জেণ্টের মারিবার কোনই ক্ষমতা ছিল না। সার্জ্জেণ্ট তখন নিজেকে বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা অভিযোগ করে

যে, কয়েদী তাহাকে কুৎসিৎ ভাষায় গালি দেয়, তাহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া আঘাত করে, পরে কয়েদী তাহাকে মারিয়া তাহার হাত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। কয়েদীর বিচার হয়। তিনি সত্য কথা প্রকাশ করিয়া পরে বলেন, সার্জ্জেণ্ট যাহা বলিয়াছে ও করিয়াছে তাহাতে তাহার ব্যক্তিগত অপরাধ নাই, কেন না যে প্রথায় জেলখানা পরিচালিত হয় সেই প্রথাই সার্জ্জেণ্টকে ঐ প্রকার আচরণে প্ররোচিত করে। তিনি আরো বলেন যে, সার্জ্জেণ্টের বিরুদ্ধে তাঁহার কোনও নালিশ নাই। এমনি করিয়া যাঁহারা ক্রুশ-বিদ্ধ খৃষ্টের ন্যায় সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন তাঁহারা অজেয়। কোন ভয় বা কোন শাস্তিই তাঁহাদিগকে জয় করিতে পারে নাই।

এমনি অত্যাচার যে কেবল আমেরিকা যুদ্ধকালেই নিজ প্রজার উপর করিয়াছে তাহা নহে। ইংলণ্ড, ইটালী, রাশিয়া প্রভৃতি সকলেই আবশ্যক উপস্থিত হইলেই নিজ প্রজাকে এমনি ভাবে নির্য্যাতিত করিতে দ্বিধা করে নাই।

নির্য্যাতন ব্যর্থ হয় সেইখানেই যেখানে নির্য্যাতিত আত্মিক বলের উপর নির্ভর করিয়া প্রসন্ন মনে এই নির্য্যাতন বরণ করিয়া লয়। আমরা ভারতবাসীরা যদি পশুবলে বিশ্বাস করিতাম তাহা হইলে ইংলণ্ড বা আমেরিকার অবস্থায় পড়িলে আমরাও হয়ত অনুরূপ ব্যবহারই করিতাম। পশুবলের ধর্ম্মই এই। যে-ই ইহা প্রয়োগ করুক—তাহার হাতেই এই মূর্ত্তি প্রকট হইয়া পড়িবে।

আজ বৈরাজ্য-ভুক্ত ভারতবর্ষ এই পশুবলের বিরুদ্ধে জগৎকে সাক্ষী করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসভা অহিংসার দ্বারা পশুবলকে পরাজয় করিতে পণ করিয়াছেন। পশুবলের বিরুদ্ধে

অভিযান মুখ্যতঃ ভারতে আমলা-তন্ত্র-শাসন-প্রথা সংস্কারের জন্য প্রযুক্ত হইলেও ইহার দ্বারা জগতের সমস্ত প্রধান রাষ্ট্র শক্তিই প্রভাবিত হইতে বাধ্য। ভারতবর্ষ প্রাণের দায়ে এই পথ অবলম্বন করিলেও ইহার প্রসার জগদ্ব্যাপী ; বলদৃপ্ত আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে ইহা শক্তিশালী বিদ্রোহ। ভারতবর্ষের প্রচেষ্টা আধুনিক জগতের সভ্যতার ধারা পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে, যদি ভারত নিজেকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়।

এই সামর্থ্য সঞ্চয়ের জন্য রাষ্ট্রীয় মহাসভার সমস্ত কর্ম্ম-প্রচেষ্টা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আস্তিক্য দ্বারা প্রভাবিত হওয়া আবশ্যক। কংগ্রেস এই কঠিন পথ সব সময় গ্রহণ করিতেছেন না। কংগ্রেসের মূল কার্য্যকরী সমিতি হইতে প্রান্তীয় জিলা ও গ্রাম্য সমিতির মধ্যে শুদ্ধ ভাবের অনুপ্রেরণা সর্ব্ব সময় ক্রিয়াশীল না হইলে ভারতবর্ষের সে সামর্থ্য আসিবে না। কংগ্রেস মনে-প্রাণে-বাক্যে-কর্ম্মে অহিংস হইলেই শ্রেয়ের মার্গে অগ্রসর হইতে পারিবে। কংগ্রেসের ভিতরেই যদি মলিনতা থাকে তবে তাহা অন্যকে কি করিয়া পবিত্র করিবে ? লবণই যদি নিজ স্বাদ হারায় তবে তাহাকে আর কি দিয়া লবণাক্ত করা যাইবে।

যেখানে ছলের আশ্রয় সেখানে পশুবলেরও আশ্রয়। দেশোদ্ধারের সামর্থ্য কংগ্রেস সেইখানেই হারাইয়া ফেলে। কংগ্রেস কর্ম্মীগণ ও নেতৃগণ একমাত্র ঈশ্বরের বলে বলবান হইলেই কংগ্রেসকে পশুবলের বিরুদ্ধে জয়ী করিতে পারিবেন।

ভারতের বর্ত্তমান গৌরব

ভারতবর্ষের অতীত গৌরব-কাহিনীতে ততদিন হৃদয়ে তৃপ্তি আসিতে পারে না যতদিন না নিজেকে সেই অতীতের সহিত জীবনে ও আচরণে যোগযুক্ত করিতে পারা যায়। সাধারণতঃ যে অতীত গৌরবের স্তুতি উদ্গীত হয় তাহা মিউজিয়মে রক্ষিত সুসজ্জিত মৃত জন্তুর সৌন্দর্য্যের স্তুতির ন্যায়। তখনকার দিনে ভারত গৌরবময় ছিল, কিন্তু আজ-কালকার উন্নতির যুগে যাহা যাহা আবশ্যক তাহা আমাদের নাই, এই বোধ সর্ব্বদাই পীড়া দেওয়াতে পুরাতনের স্তুতিতে আনন্দ আসে না, কর্ম্ম-প্রেরণাতে নৈরাশ্য আসিয়া পড়ে। কিন্তু যাহার দৃষ্টিতে অতীত গৌরব অন্তর্হিত হয় নাই, যিনি মনে করেন সেই গৌরব আজও ভারতবর্ষের বিশেষ সম্পত্তি, তাঁহার কাছে অতীতের স্তুতিতে দাহ নাই, বর্ত্তমানের বিক্ষেপে চাঞ্চল্য নাই। তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকে এমন একটা বোধ যাহাতে তিনি নির্ভীক চিত্তে ভারতের ভারতীয়ত্বের উপর দাঁড়াইয়া সকল জগৎকে বলিতে পারেন যে, তিনি ভারতবাসী, হিন্দু সভ্যতায় ওতঃপ্রোত ভাবে মজ্জিত এবং তিনি ভারতীয় সভ্যতার ভিতরেই সেই সুখ-সন্তোষ ও শান্তির সন্ধান পাইয়াছেন যাহার খোঁজ করিতে গিয়া জগতের বড় বড় রাষ্ট্রশক্তি আত্মঘাতী কলহে জগৎকে পীড়িত করিতেছে ও নিজেরা পীড়িত হইতেছে। গান্ধীজীর এই অনুভূতি প্রবল ভাবে আছে, আর তাহা প্রবল অথচ সংযত ভাবে ব্যক্ত করার ক্ষমতাও তাঁহার আছে। বর্ত্তমান ভারত সম্বন্ধে তাঁহার গভীর

গৌরব বোধ নানা ভাবে ব্যক্ত হইতেছে। তিনি স্পষ্টই বলিতেছেন যে, তিনি সনাতনী হিন্দু, তিনি বর্ণাশ্রমী হিন্দু, তিনি সত্য ও অহিংসাকে হিন্দু ধর্ম্মের পাদপীঠ বলিয়া জানেন, তিনি বিশ্বাস করেন—ভারতবর্ষের বিশিষ্ট অনুভূতি জগৎকে দিবার মত এবং তাহাদ্বারা হিংসাপূর্ণ ভোগাশ্রয়ী পাশ্চাত্য অতিসভ্য সভ্যতা সংশোধিত হইতে পারে। তবে ভারত আজ বৈদেশিক শাসনে আর্ত্ত বলিয়া ভারতের বিশেষ সম্পদ দ্বারা এই আর্ত্তির জয় করিলে তবে অপরকে সে সম্পদ বিলাইবার সময় আসিবে।

সম্প্রতি 'কেল্লগ্-প্যাক্ট' সম্পর্কে 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' তাঁহার মন্তব্যের ভিতর দিয়া তাঁহার এই সংযত অথচ দুঃখ-জড়িত গৌরব-বোধ অপূর্ব্ব ভাবে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। 'কেল্লগ্-প্যাক্ট' কি তাহা প্রথমে আলোচনা করিতেছি!

১৯২০ সালে আমেরিকাতে মিষ্টার লেভিনসন আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বন্ধ করিবার প্রয়াস করিতে থাকেন। তাঁহার চেষ্টায় ধীরে ধীরে জন-মত গঠিত হইতে থাকে। ১৯২৭ সালে যখন মিষ্টার লেভিন্সনের চেষ্টার ফলে আমেরিকা ও ফ্রান্সের মধ্যে একটা যুদ্ধ-বন্ধ করার প্রস্তাব পাকা হইয়া উঠে তখন আমেরিকার ষ্টেট্ সেক্রেটারী মিষ্টার কেল্লগ্ জানান যে, এই প্রকার প্যাক্ট দুইটী রাজ্যের মধ্যে কেবল মাত্র না করিয়া সকল রাজ্যের স্বাক্ষরিত হওয়াই দরকার। তখন একটা আন্তর্জাতিক যুদ্ধ পরিত্যাগ-মূলক চুক্তিপত্র প্রস্তুত হইয়া ১৯২৮ সালের আগষ্ট মাসে ১৫টী রাজ্য কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। তারপর ৫।৬ মাসের মধ্যেই পৃথিবীর সকল রাজ্যই এই প্যাক্ট বা চুক্তি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইহাই 'কেল্লগ্-প্যাক্ট' বা যুদ্ধবিরোধী চুক্তি বলিয়া পরিচিত।

'কেল্লগ্-প্যাক্টের' সর্ত্ত মাত্র তুইটী। প্রথম সর্ত্তদ্বারা স্বাক্ষরকারীগণ তাঁহাদের জাতির ও রাজ্যের প্রতিভূস্বরূপে স্বীকার করেন যে, তাঁহাদের নিকট যুদ্ধ করাটা জাতীয় রাজনীতির অঙ্গীভূত নহে। দ্বিতীয় সর্ত্ত এই যে, তাঁহাদের মধ্যে যে কোনও বিবাদ উপস্থিত হইবে, শান্তিপূর্ণ উপায় ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে তাঁহারা তাহার মীমাংসাকামী হইবেন না। এই ত গেল 'কেল্লগ্-প্যাক্ট'। ইহার উদ্যোক্তারা ইহা হইতে অনেক সুফল আশা করেন। এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, যে-সকল ষ্টেট্ হিংসায় ও বল-প্রয়োগে বিশ্বাস করে, হিংসালব্ধ আয়াস-উপকরণে সজ্জিত, যাহারা অপর জাতিকে বলপূর্ব্বক নিপীড়ন করে, শোষণ করে, অন্যায় পূর্ব্বক ও অপরের অক্ষমতার আশ্রয় লইয়া নিজ পণ্য জবরদস্তি করিয়া অপর দেশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে দেশে বিক্রয় করে, তাহারা ত সত্যকার শান্তিকামী হইতে পারে না। নিজ রাজ্য মধ্যেই যদি বোলসেভিকেরা বলপূর্ব্বক স্বাধীন মত ব্যক্ত করার পথ না দেয়, ভিন্ন মতাবলম্বীকে নির্য্যাতিত করে, তাহারা কি করিয়া জগতের শান্তি কামনা করিতে পারে? সোভিয়েট রাশিয়া বা ফ্যাসিষ্ট-ইটালী কি করিয়া সত্যকার শান্তিকামী হইবে? আবার যাহারা অপর দেশ দখল করিয়া স্বার্থ পূরণ করিতেছে, তাহারা সত্যিকার জাগতিক শান্তিকামী হইবার পূর্ব্বে সে দেশগুলির উপর হইতে বন্ধনের নাগপাশ তাহাদের খুলিয়া আনিতে হয়। ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষের ও আরো অনেক স্থানের দখল ত্যাগ করিতে হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার সকল জাতিই যেমন ভাবে এশিয়া ও আফ্রিকা ভাগ করিয়া লইতেছে সে ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপার ছাড়িয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতে হয়। জাপানকে

মাঞ্চুরিয়া ও চীনের সম্পর্কিত দেশের ও বাণিজ্যের লোভ ছাড়িতে হয়, ভারতে কাপড় বেচা বন্ধ করিতে হয়। আমেরিকাকেও ফিলিপ্পাইন ছাড়িতে হয়, নিগ্রোর লাঞ্ছনা ত্যাগ করিয়া নিগ্রোর সহিত ভ্রাতৃত্ব করিতে হয়। এই সকল ইঁহারা পারিবেন কি? স্বইচ্ছায় ইহা পারা বড় অসম্ভব। কেন না নিষ্পিষ্ট জাতির উৎপন্ন দ্রব্যজাতের ভোগে ইঁহারা পুষ্ট ও তুষ্ট আছেন। সে ভোগ বন্ধ হইলে চলিবে কি করিয়া? চাল অনেক খাটো করিতে হইবে। বিধাতার আঘাত ছাড়া এ অসম্ভব সম্ভব করা চুক্তির কর্ম্ম নহে। আগাগোড়া সভ্যতাটা বদলাইয়া ফেলা দরকার। যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন জাগতিক শান্তি কামনায় স্বাক্ষর করা ষ্টেট্-সকলের পক্ষে অসত্যাচরণ। এই অসত্যাচরণই প্যাক্টকে নিষ্ক্রিয় করিবে।

শান্তিকামী মিষ্টার এল, ই, 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে 'কেল্লগ-প্যাক্ট' সম্বন্ধে এই অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, যদি ভারতের প্রত্যেক স্কুল ও কলেজে শান্তি কামনার কথা, 'কেল্লগ-প্যাক্টের' কথা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে ক্রমশঃ এই ধারণা শিক্ষিত ব্যক্তি হইতে জন-সাধারণে প্রসার লাভ করিবে এবং ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হইবে তখন শান্তিপূর্ণ থাকারই পক্ষপাতী হইবে।

এই প্রস্তাব সম্পর্কে গান্ধীজী লিখিতেছেন ঃ—"জগতের শান্তি কল্পে ভারতবর্ষের দানের রূপ পাশ্চাত্য জাতি সকলের দানের রূপ অপেক্ষা স্বভাবতঃই ভিন্ন প্রকারের হইবে। ভারতবর্ষ স্বাধীন জাতি নহে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছা-শক্তিও ভারতবর্ষের নাই। যে সকল জাতি

'কেল্লগ-শান্তি-প্যাক্টে' স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এশিয়া ও আফ্রিকা-বাসীদিগকে দাবাইয়া স্বার্থসিদ্ধি করিতেছেন। আর যত জাতি ইঁহাদের দ্বারা শোষিত হইতেছে তাহার মধ্যে ভারতবর্ষ সব চাইতে অধিক শোষিত জাতি। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, 'শান্তি-প্যাক্ট' হইতেছে শোষণ-কারীদের পরস্পরের মধ্যে প্যাক্ট বা চুক্তি যাহাতে পরস্পরের মধ্যে সখ্য রাখিয়া একযোগে শোষণ করা যায়। ভারতবর্ষ অন্য কোনও জাতির উপর যুদ্ধার্থে অভিযান করে নাই; ভারতবর্ষ কখনো কখনো অনিয়ন্ত্রিত বা অল্প-নিয়ন্ত্রিত ভাবে কেবলমাত্র আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধোদ্যম করিয়াছে। এই কারণে ভারতবর্ষে শান্তি-প্রিয়তার মনোবৃত্তি সৃষ্টি করার আবশ্যক নাই। ভারতবর্ষের ভিতরে শান্তিকামী মনোবৃত্তির প্রাচুর্য্য আছেই—একথা ভারতবর্ষ জানুক আর নাই জানুক। আজ ভারতবর্ষ শান্তিপূর্ণ উপায়ে অপর কর্ত্তৃক ভারত-শোষণ রোধ করিয়া জগতের শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইতে পারে। কিন্তু সেজন্য ভারতকে স্বাধীন হইতে হয়, অথবা এবারের জন্য ইহার যে সংজ্ঞা স্থির হইয়াছে—ঔপনিবেশিক শাসন পাইতে হয়। ভারতবর্ষ যদি এই উপায়ে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে কোনও জাতি একক জগতের শান্তি স্থাপনার জন্য যাহা করিতে পারে তাহার চূড়ান্ত করা হইবে।

যদি আমার যুক্তি ঠিক হয়, তবে মিষ্টার এল, ই, স্কুলে প্যাক্টের বিষয় শিক্ষা দেওয়ার কথা যাহা বলিতেছেন তাহা যে কেবল নিরর্থক হইবে তাহা নহে, উহাতে কুফলই হইবে, উহাতে কপটাচার করা হইবে। যদি বা শিক্ষকেরা প্যাক্টের কথা বুঝিতে পারেন ছাত্র-ছাত্রী-

দিগের নিকট হইতে ইহার কোনও সাড়া পাওয়া যাইবে না। যে ব্যক্তি কোনও দিন একটা মাছিকেও মারে না তাহাকে হত্যা করা অনুচিত বলিয়া উপদেশ দেওয়া যেমন অনাবশ্যক ও পণ্ডশ্রম, ভারতের স্কুলে শান্তি কামনা শিক্ষা দেওয়াও তেমনি অনাবশ্যক ও পণ্ডশ্রম।

আমি দেখিতেছি যে, ভারতবর্ষের সভ্যতা একটা শীর্ষস্থানে পঁহুছিয়া আছে যেখানে মারামারি কাটাকাটির প্রতি তাহার স্বভাবতঃই বিরাগ আছে। এই স্বভাব-বিরাগ হঠাৎ বা এক দিনে হয় নাই। সহস্র সহস্র বৎসরের আত্মোন্নতির ও অধ্যাত্ম-শিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখিয়া ভারতবর্ষ মনে কর্ম্মে বচনে অহিংস হইতে পারিয়াছে। অবশ্য ভারতবর্ষের ভিতরেই কোনও কোনও জাতি আছেন যাঁহারা তত শান্তিকামী নহেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, তাঁহাদের ভারতীয় অধ্যাত্ম-শিক্ষার ধারা অব্যাহত থাকে নাই। আজ যদি অতি-সভ্যতার পীড়া-ভারে ক্লান্ত জগৎ শান্তি কামনা তবে তাহাকে ভারতের অহিংস-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ভিতর হইতে শুদ্ধ হইতে হইবে। একদিকে জবরদস্তি. আর একদিকে চুক্তি—এমন করিয়া স্থায়ী শান্তির উদ্ভব হইতে পারে না।

আমাদের দেশেও যাঁহারা স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় যে কোনও একটা উত্তেজক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক, এদিক দিয়া তাঁহাদেরও ভাবিবার আছে। আজ বল-দৃপ্তের অন্তরের ভীতি, বাহ্যতঃ অত্যাচারের আকারে ফুটিয়া উঠিয়া জগৎকে লাঞ্ছনায় লাঞ্ছনায় জর্জ্জরিত

করিয়াছে। আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ এই ভোগের আগুনে, ভীতির ছলনাময় শিক্ষায় শান্তিবারি নিক্ষেপ করিতে পারে। যুদ্ধ-ক্লান্ত পশ্চিমের ঋষিগণ ভারতবর্ষের দিকেই শান্তি কামনায় তাকাইয়া আছেন। ইহাই বর্ত্তমান ভারতের গৌরব। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত ভারতের অন্তর হইতে এই গৌরব-বোধ দূর করিতেছে। ঈশ্বর করুন, শিক্ষিত ভারতবাসী যেন সবিনয়ে এই গৌরব বহন করার মর্য্যাদা অনুক্ষণ স্মরণ রাখেন।

"করোনা করোনা লজ্জা হে ভারতবাসী,
শক্তিমদ মত্ত ওই বণিক্ বিলাসী
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখে
শুভ্র উত্তরীয় পরি' শান্ত সৌম্য মুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন!
শুনোনা কি বলে তারা, তব শ্রেষ্ঠ ধন
থাকুক্ হৃদয়ে তব, থাক্ তাহা ঘরে,
থাক্ তাহা সুপ্রসন্ন ললাটের পরে
অদৃশ্য মুকুট তব! দেখিতে যা বড়,
চক্ষে যাহা স্তূপাকারে হইয়াছে জড়
তারি কাছে অভিভূত হ'য়ে বারে বারে
লুটায়োনা আপনায়! স্বাধীন আত্মারে
দারিদ্র্যের সিংহাসনে কর প্রতিষ্ঠিত
রিক্ততার অবকাশে পূর্ণ কর চিত!"

(রবীন্দ্রনাথ)

এই মর্য্যাদা-বোধ আমাদিগকে সকল অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করুক। ফ্যাসিষ্টের কালো সার্ট, মুসেলিনীর জবরদস্ত হুম্‌কী, বোলশেভিকের রক্ত-কাস্তের আস্ফালন, ইউরোপের যান্ত্রিক সভ্যতা, ঐ সকলের অন্তরালে যে ক্ষুধিত বীভৎসতা আছে তাহা বুঝিবার মত শক্তি ঈশ্বর যেন আমাদিগকে দেন। তিনি যেন অহিংসার গৌরবে ভারতবর্ষকে সকল গ্লানি-মুক্তির পথে নিয়ন্ত্রিত করেন।

কালো নিগ্রো

বিলাতের লোকেরা মজুরী পাইতেছে না, তাহাদিগের হাতে কাজ দেওয়া দরকার। এই জন্য পার্লামেণ্টে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় যে, আফ্রিকার উপনিবেশের শ্রীবৃদ্ধি কল্পে সেখানে বড় বড় কাজ হাতে লওয়া হউক। রেল-লাইন পাতা, পুল তৈয়ারী করা ইত্যাদি কাজ আরম্ভ হইলে তাহার উপকরণ ইংলণ্ড যোগাইয়া ইংরাজ মজুরের ক্ষুধা শান্ত রাখিতে পারিবে। ইংলণ্ডে ধনীর অভাব নাই আবার আর্ত্তেরও অভাব নাই। ধনীদের হাতে টাকা আছে। ক্ষুধার্ত্ত মজুরেরা কাজ চায়। ধনীদের টাকা যদি কোনও কাজে খাটানো যায় তবে ধনীদের টাকা আরো বাড়ে, ক্ষুধার্ত্তেরও ক্ষুধা মেটে। কিন্তু কাজ কোথায়! কাজ নাই, কাজ বিহনে ইংলণ্ডের মজুর বেকার। তাই কাজের সন্ধান চারিদিকে; সৈন্য ইঞ্জিনিয়ার ভূ-তত্ত্ব-বিৎ ও বৈজ্ঞানিক সমস্ত শক্তি দিয়া ইংলণ্ডের জন্য কাজ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন যাহাতে ইংলণ্ডের শ্রমিক বাঁচিতে পারে! ভুলপথ; কিন্তু এই পথই আজ জগতের সত্যপথ বলিয়া সকলে মানিয়া লইয়াছে। কলের দানব সৃষ্টি করিয়া কাজ লাঘব করা, আবার সেই দানবের ক্ষুধার যোগ্য কাজ জোটাইবার জন্য অর্দ্ধেক পৃথিবীর মানুষকে নিপীড়ন করা, এই ভুলেরই পরিণতি। কাজ জোটাইবার বিলে পার্লামেণ্টের সকলেই সন্তোষ লাভ করেন। কিন্তু কর্ণেল ওয়েজউডের দৃষ্টি সাধারণ হইতে বিভিন্ন। এই কাজ জোটাইবার

পশ্চাতে যে বীভৎসতা আছে—তাহা তিনি পার্লামেণ্টের সমক্ষে ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন—পার্লামেণ্টকে জানানো হইয়াছে যে, আফ্রিকায় জোর করিয়া মজুর খাটানো হইবে না। কিন্তু আসল ব্যাপার এই যে, টেক্স বসাইয়া, গবর্ণমেণ্টের চাপ দিয়া ও গ্রাম্য সর্দ্দার দিয়া চাপ দেওয়াইয়া মজুরদিগকে কার্য্য করিতে বাধ্যই করানো হয়। মজুরদের (নিগ্রো) তুর্দ্দশা বর্ণনার বাহিরে। কঠিন পীড়ায় ঐ সকল মজুরেরা ভুগিয়া থাকে। এক রকম পোকায় উহাদিগকে আক্রমণ করে ও পায়ের ভিতর ছিদ্র করিয়া ঘা করিয়া দেয়। ইহা ত আছেই, তারপর যখন আমাশয় রোগ ঢোকে তখন মশা-মাছির মত এই মজুরগুলি মরে। শীতকালে অসহ্য শীতের প্রকোপ সহিতে হয়, বর্ষাকালে আবার বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজা কাপড়েই কাজ করিতে হয়, সেই কাপড়েই রাত কাটাইতে হয়। গ্রাম হইতে নিগ্রো মজুরগুলিকে জোর করিয়া ধরিয়া আনার ফলে কেবল স্ত্রীলোকেরাই গ্রামে পড়িয়া থাকে। একটা ছেলে পিঠে করিয়া, আর একটা হয় ত গর্ভে আছে—এমনি অবস্থায় নিগ্রো-মায়েদের মাঠে লাঙ্গল চষিতে হয়। কেন হয়? নিগ্রো মজুরদের এই তুঃখের হেতু যে শ্বেত মজুর সে কথা শুনাইয়া কর্ণেল ওয়েজউড বিলের প্রতিবাদ করেন। কিন্তু শ্বেত মজুরের সুবিধার জন্য নিগ্রোদিগকে যদি গ্রাম্য জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নরক বাস করিতে হয়, তাহা হইলেও তাহাতে সাম্রাজ্যবাদীদের শিহরিয়া উঠিবার কথা নহে, বরং ওয়েজ-উডের তীব্র মন্তব্য সত্ত্বেও বিল পাশ হইয়া গিয়াছে। কালো জাতির তুঃখের বোঝা সাদা জাতিরা এমনি করিয়াই বহন করিয়া আসিতেছেন!

বিলাতে আজকাল শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট আছে, কিন্তু সে গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও কালো লোককে ত নহেই, ব্রিটিশ ছাড়া অন্য লোককেও মানুষ জ্ঞান করিতে বিলম্ব আছে।

লাল ইণ্ডিয়ান

খৃষ্টীয় মিশনগুলির এক কংগ্রেস যখন এবার ভিয়েনায় বসে, তখন ফাদার গুইসিন্‌ডে সেখানে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহার বক্তব্য বিষয় ছিল আদিম জাতিগুলির প্রতি ইউরোপীয়দের পাপাচরণের নিন্দাবাদ।

ফাদার গুইসিন্‌ডে সমাগত ধর্ম্মযাজকদিগের সভায় ইউরোপের পাপাচারের যে কাহিনী বিবৃত করেন তাহাতে প্রত্যেকেরই মনুষ্যত্ব-বোধ লাঞ্ছিত হয়। তাঁহার বর্ণনা নরহত্যা, নিষ্ঠুরতা, অবিচার ও পশুত্বের কাহিনীতে পূর্ণ ছিল। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে ও পাটা-গোনিয়াতে সেখানকার আদিম অধিবাসী লাল ইণ্ডিয়ানদিগকে ইউরোপীয়েরা শীকারের বস্তু বলিয়া মনে করে—একথা যদি বলা যায় তাহা হইলেও বাড়াইয়া বলা হয়, তাহাদিগকে তদপেক্ষাও নগণ্য, তুচ্ছ, ঘৃণ্য কৃমি-কীটাদির ন্যায়ই ধরা হইয়া থাকে। যেখানে মেষ চরাইবার উপযুক্ত মাঠের আবশ্যক সে স্থানে যদি ইহাদের বসতি থাকে তবে সে স্থান লওয়ার সময় ইহাদিগকে টিপিয়া মারিয়া জায়গা সাফ করা হয়।

ফাদার গুইসিন্‌ডে অনেকদিন আমেরিকার পাটাগোনিয়াতে আছেন। সেখানকার এক আদিম জাতি তাঁহাকে নিজেদের একজন বলিয়া গ্রহণ

করিয়াছে। তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বলেন যে, লাল ইণ্ডিয়ানদিগকে গুলি করিয়া মারিলেও তাহাদের প্রতি দয়া করা হইত। মাংসের ভিতর ষ্ট্রিকনিন্ বিষ (কুচ্‌লে) খাওয়াইয়া ইহাদিগকে মারিয়া ফেলা হয়। কি উপায়ে এই বিষাক্ত মাংস খাওয়ান হয় ফাদার সে কথা বর্ণনা করেন নাই। তিনি আরো বলেন যে, কুকুর যেমন খরগোস দেখিলেই কামড়াইয়া ধরে, তেমনি একদল কুকুর পোষা হয় যাহারা লাল ইণ্ডিয়ানদের ছোট ছেলে দেখিলেই টুটি কামড়াইয়া মারিয়া ফেলে। দক্ষিণ ব্রাজিলে 'বোগ্রো' নামক ইণ্ডিয়ানদলকে গুলি করিয়া মারা এখনো একটা শীকার করার আমোদ বলিয়া গণ্য।

এই পৈশাচিক কীর্ত্তির বর্ণনা আজগুবি গল্প হইলেই সুখের হইত, কিন্তু তাহা মনে করিবার হেতু নাই। যাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁহাদেরই একজন এক সহস্র পাদ্‌রীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন ঈশ্বরের সমক্ষে স্বজাতীয়ের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিয়াছেন।

কালো ভারতীয়

কালো নিগ্রো ও লাল ইণ্ডিয়ানদের উপর সাদার পাশবিকতার উপরোক্ত নিদর্শন যতই নিদারুণ হউক, আজ ভারতীয়ের উপর ইউ-রোপীয়রা ও আমেরিকানরা যে পাশবিকতার অনুষ্ঠান করিতেছে তাহা অধিকতর নিদারুণ। কয়েক সহস্র বা কয়েক লক্ষ নিগ্রো ও লাল ইণ্ডিয়ানকে শীকার করিয়া, বিষ খাওয়াইয়া ও কুকুর দিয়া খাওয়াইয়া মারা যত ভয়ানক হউক, তাহা ভারতীয়দের উপর অনুষ্ঠিত অন্যায়ের তুলনায় ম্লান হইয়া যায়। পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ লোক যে ভূখণ্ডে বাস

করিয়া জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল সেই বিশাল ভারতীয় জাতি, যাহারা কর্ম্মকে ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া লোভের বর্ব্বরতা দিন দিন মনুষ্য সমাজ হইতে বহিষ্কার করিবার সাধনা সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, সেই জাতি আজ অজ্ঞতার পঙ্কে মগ্ন, অন্নহীন বলিয়া লোক দুর্ভিক্ষে মরিতেছে, এক-পঞ্চমাংশ লোকের এক বেলা বই দুই বেলা আহার জোটে না, পুষ্টির অভাবে অকর্ম্মণ্য হয়, পীড়িত হয়, দলে দলে মরে। এই মৃত্যুর পশ্চাতে পশ্চিমের লোলুপতাই বর্ত্তমান।

কিসের দ্বারা যে এই লোলুপতার, এই অপ্রেমের উপর জয়লাভ করা যায় সে সন্ধান গান্ধীজী পাইয়াছেন। প্রেম দ্বারাই ইহা জয়—গান্ধীজী সেই শিক্ষা নূতন করিয়া পতিত ভারতকে দিতেছেন।

রাশিয়া ইটালী ও ভারতের কর্ম্মবাদ

ইংরাজ অধিকৃত ভারতবর্ষে শিক্ষা ক্রমেই বিস্তার লাভ করিতেছে। যে পরিমাণে এই বিশেষ ইংরাজী ধাঁচের শিক্ষা বিস্তৃত হইতেছে সেই পরিমাণেই সুখ-ভোগের প্রতি শিক্ষিতেরা অধিক আকৃষ্ট হইতেছেন এবং তাঁহাদের উদাহরণে জন-সাধারণকেও কথঞ্চিৎ আকৃষ্ট করিতেছেন। যে শিক্ষা আমরা আজকাল পাইতেছি তাহার পরিচয় ভারতবাসীর নিকট নূতন নহে।

আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩ ॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥
অনেক চিত্ত বিভ্রান্তা মোহজাল সমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥

(গীতা ১৬শ অধ্যায়)

"শত শত আশা-পাশ দ্বারা আকৃষ্ট এবং কাম-ক্রোধ-পরায়ণ মানব কাম-ভোগের জন্য অন্যায় পথে অর্থ সঞ্চয়ের ইচ্ছা করে। অদ্য মৎ কর্তৃক

ইহা লব্ধ হইল, এই প্রিয় বস্তু পাইব, ইহা আমার আছে, পুনরায় এই ধনও হইবে, ঐ শত্রু মৎ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, অপরকেও আবার বিনাশ করিব। আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান ও সুখী, আমি ধনী এবং কুলীন, আমার সদৃশ অন্য কে আছে? আমি যজ্ঞাদি করিব, দান করিব, আমোদ করিব, এই ভাবে অজ্ঞান দ্বারা বিমোহিত, অনেক প্রকারে ভ্রান্তচিত্ত, মোহজাল দ্বারা সমাবৃত এবং কামভোগে অভিনিবিষ্ট মানুষ অশুচি নরকে পতিত হয়।"

যে শিক্ষা ইংরাজ আজ ভারতবর্ষে দিতেছে তাহা এই শিক্ষা। এই শিক্ষা যে কেবল স্কুল-কলেজ হইতে বিতরিত হইতেছে তাহা নহে, সামাজিক জীবনযাত্রার প্রতি স্তরে এই শিক্ষা অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে। উকীল মক্কেলের ভিতর, দারোগা-ম্যাজিষ্ট্রেটের ব্যবহারে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রগতিতে এই একই শিক্ষা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বত্রই স্বার্থান্বেষণ—যজ্ঞ নাই, যজ্ঞ-প্রবৃত্তি নাই। যদি যজ্ঞ হয় তাহার মধ্যেও "যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্।"

১৯২১ সালে একবার এই শিক্ষার বিরুদ্ধে জাতি ধিক্কার দিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু ১৯২১-এর স্মৃতি যতই পুরাতন হইতেছে ততই তাহার আদর্শও আবার দূরবর্ত্তী হইতেছে। সমস্ত সভ্য জগত আজ এই শিক্ষায় উন্মত্ত। তাই যেখানেই সামাজিক উন্নতি সাধিত হইতেছে, রাষ্ট্র ভাঙ্গা-গড়া হইতেছে, জন-গণের হিতানুষ্ঠানের সূচনা হইতেছে সেখানেই স্বার্থান্বেষী, দাম্ভিক, বল-প্রয়োগকারী সভ্যতার আশ্রয়েই কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। ইহার ফলে আমরা যেন এই কথাটাই মানিয়া লইতে বাধ্য হই যে, এইটাই "যুগধর্ম্ম"। কিন্তু অধর্ম্ম, অসত্য ও হিংসা

যদি যুগধর্ম্মই হইয়া থাকে, তবে তাহার বিরুদ্ধেও মানুষ দাঁড়াইবে। মানুষের অন্তর-নিবাসী যে আত্মা সে সমস্ত যুগের অতীত, সে অনাদি এবং শাশ্বত। সেই আত্মার তৃপ্তি যুগধর্ম্মের দোহাই দিলে মিলিতে পারে না; বড় বড় গালভরা কথাতেও মনের ভিতর ফাঁক রহিয়া যায়।

রাশিয়াতে জন-সাধারণের নামে যে সোভিয়েট-শাসন চলিতেছে তাহার পশ্চাতে একটা বৃহৎ জবরদস্তি মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহা জোর করিয়াই দেশের লোকের হিত করিতে যত্নবান। হিতও হইতেছে। স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়াছে, লোক রাষ্ট্রীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইতেছে, সাধারণ ভাবে সুসংস্কার সাধিত হইতেছে, কোন কোনও বিষয়ে ভেদ-বুদ্ধি দূর হইতেছে, অহিতকর শ্রেণী-বিভাগ নষ্ট হইতেছে।

রাশিয়ার পাশে ইটালীতে আবার আর এক নূতন ধাঁচের বল-প্রয়োগের উপর নির্ভর করিয়া জাতি গঠিত হইয়া উঠিতেছে। মুসোলিনী সেখানে স্রষ্টা, কর্ত্তা ও বিধাতা। তাঁহার অনুবর্ত্তী ইটালী—ফ্যাসিষ্ট-ইটালী। ফ্যাসিষ্টের সার্টের রং কালো, আর সোভিয়েটের রং লাল। লাল ও কালোতে যেমন বর্ণ-বৈষম্য, ফ্যাসিজম্ ও লেনিনিজমের মধ্যেও তেমনি বৈষম্য। বোলশেভিক রাশিয়া রাজ-তন্ত্রের বিরোধী। তাই রাশিয়ায় রাজাকে নিষ্ঠুর ভাবে সপরিবারে হত্যা করিয়া জিঘাংসা চরিতার্থ করা হইয়াছে। ফ্যাসিষ্ট-ইটালীতে রাজার স্থান আছে। বোলশেভিক রাশিয়া মাত্র এক জাতকেই মানে, সে জাত হইতেছে মজুর ও কৃষকের জাত। অপর সকল জাতিকেই সে বিলোপ

করিতে চায়, যদিও এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিতে পারে নাই ধনিক সম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবীদের উপরই তাহার বিশেষ আক্রোশ, তাই তাহাদের অবস্থাও রাশিয়ায় অত্যন্ত শোচনীয়। একজন সাধারণ মজুর যাহা উপার্জ্জন করে একজন শিক্ষকও তাহাই উপার্জ্জন করে। কিন্তু একজন ভাল কারিগরের উপার্জ্জন তাহার ৮ গুণ। ফ্যাসিষ্ট-ইটালীতে ধনী শিক্ষিতের যথেষ্টই স্থান আছে এবং কেহ মজুর বলিয়াই সম্মানিত এবং শিক্ষক বলিয়াই হেয় নহে।

রাশিয়াতে ধর্ম্ম কথাটাই আজ অবজ্ঞাত। গির্জ্জায় যাওয়ার পথে লিখিয়া রাখা হইয়াছে—"ধর্ম্ম জন-সাধারণের উপর অহিফেনের ন্যায় ক্রিয়া করে।" রাশিয়াতে অনেক গির্জ্জা এখন মিউজিয়ম রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ফ্যাসিষ্ট-ইটালীতে ধর্ম্ম মামুলী মর্য্যাদা পাইতেছে। বরং ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জাতি-গঠনের প্রয়াস চলিতেছে। রাশিয়া সৈন্য-সজ্জায় ভারাক্রান্ত; কিন্তু তথায় পর-দেশ জয়ের লোভ নাই; বরং যে সকল বিভিন্ন রাজ্যের সমষ্টিতে এক শাসন-তন্ত্র গঠিত, তাহাদের বিচ্ছিন্ন হইবার ও স্বতন্ত্র ভাবে রাজ্য নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার রহিয়াছে। ইটালীও সৈন্য-ভারে ভারাক্রান্ত, কিন্তু ইটালীর সৈন্য-সজ্জা অপর দেশকে চোখ রাঙ্গাইবার জন্য ও নিজের উপনিবেশ স্থাপন ও রক্ষা করিবার জন্য। আদর্শের বিরোধ থাকা সত্বেও নবগঠিত ফ্যাসিষ্ট-ইটালী নবপ্রতিষ্ঠিত বোলশেভিক রাশিয়া নূতন ভাবে গঠিত হইয়া উঠিতেছে। উভয় দেশেই সমাজের সংস্কার হইতেছে, শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, জন-সাধারণের মধ্যে মর্য্যাদা-বোধ প্রবেশ করিতেছে। যাহা ', যাহা প্রাণহীন, তাহা পরিত্যক্ত হইয়া উভয়েই নিজ নিজ ভাবে

আধুনিক ও বীর্য্যবান হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই দুই আধুনিক ও নবগঠিত দেশের মধ্যে যে বৈষম্য তাহা স্বত্বেও উভয়কেই আধুনিক বলিলে, উভয়কেই নবযুগের বিপ্লব প্রসূত বলিলে, আধুনিকতা ও বিপ্লব যে দেশ-ভেদে কত বিভিন্ন ও বিপরীত রূপ লইতে পারে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

অন্যান্য সভ্যদেশ রাশিয়া ও ইটালীকে আজ অগ্রাহ্য করিতে পারিতেছে না, উভয়কেই সম্মান দিতে বাধ্য হইতেছে। ভারতবর্ষ যদি আধুনিক হইতে চাহে তবে কাহার মত আধুনিক হইবে? বোলশেভিক রাশিয়ার ন্যায় ধনিক ও শ্রমিকের সংঘর্ষের দ্বারা আধুনিক হইবে, না ইটালীর ন্যায় রাজা, ধনী ও শ্রমিক সকলকে যথাযথ স্থানে রাখিয়াই যুদ্ধোদ্যম ও উপনিবেশ স্থাপনের অভিলাষ লইয়া আধুনিক হইবে? ধর্ম্মকে রাশিয়ার ন্যায় অহিফেন বলিয়া জ্ঞান করিবে, না ইটালীর ন্যায় 'ষ্টেট্' বলিয়া জ্ঞান করিবে?

রাশিয়া বলে—সে সংঘর্ষের মধ্যে মুক্তি পাইয়াছে; সে রাজাকে বিনষ্ট করিয়া ধনিক সম্প্রদায়কে পিষ্ট ও কুক্ষিগত করিয়া, মজুর ও কৃষককে প্রাধান্য দিয়া, হাতুড়ি ও কাস্তের নিশান উড়াইয়া মুক্ত হইয়াছে। সে বলে—তাহার মুক্তি এত প্রাণপ্রদ, মধুর ও গতিশীল যে, জগতের সমস্ত জাতিরই তাহার পথ লওয়া উচিত। তাই সে সকল দেশকে তাহার পথ লইবার জন্য আহ্বান করিতেও দ্বিধা করিতেছে না। তাই মজুর ও কৃষক-ভোগ্যা বসুন্ধরা হইতে রাজা, ধনিক ও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার যন্ত্র সমূহ দূর করিয়া দিয়া মজুর-রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য, ধর্ম্মরূপ অহিফেনের মোহ হইতে মুক্ত করিবার জন্য অন্য দেশকেও আবশ্যক

হইলে রাশিয়া সামর্থ্য মত সৈন্য দিয়া, অর্থ দিয়া সাহায্য করে। রাশিয়া চায় মজুর-রাজ সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হউক। রাশিয়ার বোলশোভিষ্ট বলে, খাটিলেই তবে খাইবার অধিকার জন্মে। 'খাট, আর খাও, আর আনন্দ কর।' তোমার বাপ-দাদা টাকা রাখিয়া গিয়া থাকে তাহা ষ্টেটের জন্য কাড়িয়া লইব—তোমাকে উপার্জ্জন করার পথে ফেলিয়া দিব। দশজন কঠিন পরিশ্রমে উপার্জ্জন করিবে আর একজন তাহাদের শ্রমের ফলের অংশ লইয়া আরাম করিয়া থাকিবে এবং পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ করিবে তাহা সৎনীতি নয়। কাজ করিতে হইবে, কাজ কর, নিজের ভরণ-পোষণ কর। মৃত্যুকালে যদি সম্পত্তি রাখিয়া যাও তাহাতে তোমার পুত্রের অধিকার থাকা উচিত নয়। কারণ যাহা সঞ্চয় করা হইয়াছে তাহা চৌর্য্যমাত্র, ষ্টেটই তাহার একমাত্র অধিকারী। রাশিয়া আজ ঠিক এই মতটা পুরাপুরি কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই। কিন্তু উত্তরাধিকারের আইন এমন করা হইয়াছে যে, তাহাতে সম্পত্তির বেশীর ভাগই ষ্টেটে আসিবে, ভবিষ্যতে উত্তরাধিকার লোপ পাইবে।

মুসোলিনীর মতে অর্থোপার্জ্জনের জন্য পরিশ্রম একটা নৈতিক কর্ত্তব্যের মধ্যে। ইটালীতে কৃষকদের বলা হইতেছে কেবল নিজের বা আপনার জনের উদর-পূর্ত্তি বা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্যই চাষ-বাস করিও না—সমগ্র সমাজ-জীবনের পুষ্টির জন্য এই কাজ করিয়া যাও! এই সমগ্র সমাজ-জীবনের অঙ্গ স্বরূপ তুমিও আছ, তোমার অতিরিক্ত, তোমার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যের অতিরিক্ত আরও কিছু আছে। এই ভাব-প্রণোদিত হইয়া কাজ করিলে চাষ-বাস কেবল মানুষের ভাত-কাপড়ের

প্রয়োজনের তাড়নায় অনুষ্ঠিত হইবে না; ভাত-কাপড় ব্যবস্থার চিন্তা অগ্রাহ্য না করিয়াও, কৃষকের দৈনন্দিন জীবন, তার পরিশ্রম, ধর্ম্ম-কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইবে। তার শারীরিক ও মানসিক শক্তি ধর্ম্মের সেবায় লাগিবে। নাগরিকের প্রত্যেক ভাব, চিন্তা ও কর্ম্মের মধ্যে সমগ্র সমাজ-জীবনের পুষ্টির কথা মন্ত্রের ন্যায় জপিতে হইবে। এই ভাবনার ভাবুক হইলে শাসন-যন্ত্র সমগ্র সমাজ-জীবনের প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়। ফ্যাসিষ্ট-মতাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন যে, এই তত্ত্ব-কথা দেশের লোক বুঝিয়াছে। দেশের লোক হয় ত এই তত্ত্ব-কথাটির সম্যক ব্যাখ্যান না দিতে পারে, তবে তাহারা যে এই ভাব-প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিতেছে ও মাত্র এক বৎসরের চেষ্টায় এই নূতন ভাবটি ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করিতেছে তাহার সাক্ষী আছে।

বোলশেভিক রাশিয়া কর্ম্মের সংস্কার বশতঃ গায়ের জোরে সৈন্য গঠিত করিয়া, রাজা বণিক ও বুদ্ধিজীবীর ধ্বংস সাধন করিয়া কর্ম্মকে জবর-দস্তি করিয়া ষ্টেটের অভিমুখী করিতেছে। ফ্যাসিষ্ট-ইটালী কর্ম্মকে ধর্ম্মের মর্য্যাদা দিয়া ষ্টেটের জন্য কর্ম্ম করিতে বলিতেছে এবং তাহা সম্পন্ন করাইবার জন্য কেবল লোকের হিত-বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া, সৈন্যবলের ভয়ও দেখাইতেছে, বল প্রয়োগ করিয়াই দেশের লোককে ষ্টেটের জন্য কর্ম্ম করিতে বাধ্য করিতেছে। ভারতবর্ষ রাশিয়ার কর্ম্মবাদ গ্রহণ করিবে, না ইটালীর কর্ম্মবাদ গ্রহণ করিবে? ইহার উত্তর সোজা। আধুনিকতম ভারতবর্ষের কর্ম্মবাদ রাশিয়ার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইটালীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাহা ভারতবর্ষের পুরাতন কর্ম্মবাদ। রাশিয়া যেখানে পঁহুছিয়াছে, ইটালীর কর্ম্মবাদ তদপেক্ষা

ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে এবং ভারতের কর্ম্মবাদ তাহারও ঊর্দ্ধে উঠিয়া বলিতেছে—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্ত সঙ্গঃ সমাচর॥

সমস্ত কর্ম্মই যজ্ঞভাবে সম্পন্ন করিবে, নচেৎ বন্ধনগ্রস্ত হইবে। আসক্তি-শূন্য হইয়া, কর্ত্তব্য বলিয়াই কর্ম্ম করাকে যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করা বলে।

রাশিয়া বলে, সকলকেই নিজের জন্য কাজ করিয়া যাইতে হইবে। অলস হইয়া থাকা চলিবে না। ইটালী বলে, ষ্টেটের জন্য কাজ করিয়া যাইতে হইবে, তাহাতে সমষ্টির স্বার্থের মধ্যেই ব্যষ্টির স্বার্থ রহিয়া যাইবে। ভারতবর্ষ বলে, নিজের জন্যও কাজ করিবে, সমষ্টির জন্যও কাজ করিবে। কিন্তু তাহা সত্য ও সার্থক হইবে তখনই যখন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম্মই যাজ্ঞিক ভাবে সম্পন্ন করিবে।

ভারতবর্ষের জন-সাধারণের মধ্যে ভারতবর্ষের বেদান্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে ক্রিয়া করিতেছে। একজন ভারতীয় কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলে সে ইহা বুঝিতে পারিবে না; কিন্তু তাহার প্রেরণার মূল উৎস খুঁজিলে বেদান্ত-তত্ত্বই প্রকট হইয়া পড়িবে।

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়"

ভারতবর্ষের এই কর্ম্মবাদ পুরাতন হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিকতম কর্ম্মবাদ। লেনিন, মুসোলিনী ও গান্ধী স্বাভাবিক ক্ষমতাবলে জন-সঙ্ঘের প্রতিনিধি পদে প্রতিষ্ঠিত। লেনিন যাহা দিবার তাহা দিয়া গায়ের জোরে রাশিয়াকে একপথে পরিচালিত করিয়াছেন। মুসোলিনী

আজিও চেষ্টা করিতেছেন ইটালীকে তাঁহার স্বপ্নের ইটালীতে পরিণত করিতে। তিনিও গায়ের জোরেই ইটালীকে তাহার সুবৃহৎ অতীতের সহিত যোগযুক্ত করিয়া মহত্তর ইটালীতে পরিণত করিবার প্রয়াসী। তাই তিনি ষ্টেট ও ধর্ম্ম এক বলিয়া সেই ভাবে ইটালীকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। তাঁহার কাজ আজও শেষ হয় নাই। গান্ধীজী ভারত-বর্ষকে সত্যকার ভারতবর্ষে, বুদ্ধ চৈতন্য বিবেকানন্দের ভারতবর্ষে, বেদ উপনিষদ গীতার ভারতবর্ষে পরিণত করিতে চা'ন। গায়ের জোরে নয়, অহিংসা ও সত্য দ্বারা তিনি ভারতবর্ষের আত্মবোধ ফিরাইয়া আনিবার জন্য তপশ্চর্য্যা করিতেছেন। সে আত্মবোধ যেদিন কল্পলোক হইতে বাস্তবে দেখা দিবে, সেদিন ভারতবর্ষ একা তাহার ফল-ভোগ করিবে না, সমস্ত জগত ভারতের আত্মবোধে প্রবুদ্ধ হইয়া, মানুষ মাত্রেই ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া, একজাতি অন্যজাতির দিকে প্রেমভরে হস্ত প্রসারণ করিবে।

ইটালী যদি একথা বলিতে পারে যে, "চাষী তুমি চাষ কর, কিন্তু ষ্টেটের জন্য কর" তবে ভারতবর্ষ নিষ্কামভাবে লোক-সেবার জন্যই সমাজ পরিচালনার কথা বলিলে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় কেন আশ্চর্য্য হইবেন? কেন তাঁহারা ভোগ-বিলাস ও স্বার্থান্বেষণই যুগ-ধর্ম্ম—একথা বলিবেন? তাঁহাদের অবিশ্বাস দেশের অগ্রগতির পরিপন্থী হইতেছে।

সোভিয়েট রাশিয়া

সোভিয়েট রাশিয়া জগৎ হইতে জগদীশ্বরকে বিতাড়িত করার প্রতিজ্ঞা লইয়াছে। মজুর ও কৃষক রাশিয়ার দৃষ্টিতে সর্ব্বেশ্বর। প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে বিজ্ঞানের সাহায্যে সোভিয়েট-মজুর ও কৃষক যাহা কিছু উপভোগ্য আছে আদায় করিয়া লইতে চায়। এইখানেই এই জীবনেই যাহা কিছু ভোগ করিয়া এইখানেই ইহার শেষ হইবে—ইহার পর আর কিছুই নাই, ঈশ্বরের নামে একটা ফাঁকির সাহায্যে একে অপরকে ঠকাইতেছে, এ ঠকামি বন্ধ না করিলে লোকে নিজ শক্তির পূর্ণ পরিচয় পাইবে না—ইহাই সোভিয়েট রাশিয়ার মত। সেই হেতু সোভিয়েট রাশিয়া ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিষম অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু সোভিয়েট শাসন-প্রথা ধর্ম্মকে 'অহিফেন' আখ্যা প্রদান করিয়া লোককে ইহা বর্জ্জন করিবার জন্য যতই উন্মুখ হইতেছে, রাশিয়াতে ধর্ম্ম ততই গ্লানিমুক্ত হইয়া জন-গণের প্রিয় হইতেছে; সোভিয়েটের প্রতিপদে হার হইতেছে। ঈশ্বর-বিতাড়ন কার্য্যে সোভিয়েট নিছক বল-প্রয়োগ করিতেছেন। কিছুদিন পর্য্যন্ত চলে ধর্ম্মযাজকদিগকে সাজা দেওয়ার পালা। কেন না এই ধর্ম্মযাজকেরাই স্বার্থ বশে লোকের ভিতর ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত রাখার সাহায্য করে। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রথম কার্য্য হয় এই ধর্ম্মযাজকদিগকে দমন করা।

রাশিয়ার যত মন্দির ও মঠ আছে সেগুলি ১৯১৮ সালেই গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি করিয়া দেওয়া হয়। কেবল গবর্ণমেণ্ট নিজ ইচ্ছামত

মন্দিরগুলি বিনা ভাড়ায় জন-গণকে প্রার্থনাদি কার্য্যের জন্য ব্যবহারের সুবিধা দেন। মন্দির সংলগ্ন ও মঠের জন্য যে সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ছিল সেই সমস্তই সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়া ল'ন। তাহাদের বড় বড় ছাপাখানা, কর্ম্মশালা, জমি, বাগান, গৃহাদি সমস্তই গবর্ণমেণ্টের খাসের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ঈশ্বর বিতাড়নের সাহায্যে নিযুক্ত হয়। স্কুলে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া বন্ধ হয়। উপরন্তু ঈশ্বর নাই এ শিক্ষা দেওয়া হইতে থাকে। 'ঈশ্বরহীনদিগের সঙ্ঘ' নামে প্রচার-সঙ্ঘ গঠিত হইয়া গবর্ণমেণ্টেরই অঙ্গ রূপে কাজ করিতে থাকে। এই সঙ্ঘ হইতে পুস্তক প্রণয়ণ করিয়া, পাঠাগার স্থাপন করিয়া, আলোচনা-সমিতি গঠন করিয়া ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। ব্যঙ্গ-চিত্র দ্বারা খৃষ্টধর্ম্মকে উপহাস করা হয়।

৭ বৎসর এমনি ভাবে চলার পর ১৯২৫ সালে গবর্ণমেণ্ট হিসাব-নিকাশ করিতে গিয়া দেখেন, ঈশ্বরহীনদের স্থিতির ঘরে জমা অপেক্ষা খরচ বেশী হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে লোকের মধ্যে যেমন ধর্ম্ম-বিশ্বাস ছিল গবর্ণমেণ্টের পীড়নের ফলে তদপেক্ষা অধিক লোক নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছে। তখন পথ বদলানো হয়। সোজাসুজি ধর্ম্মকে উপহাস না করিয়া সূক্ষ্ম ও পরোক্ষ উপায়ে ধর্ম্মভাব নষ্ট করিবার পথ যুক্তি-যুক্ত বলিয়া তাহাই গ্রহণ করা হয়। আর ব্যঙ্গচিত্র নয়, লোকের মনে আঘাত দেওয়া নয়, কেবল প্রাকৃতিক শক্তির স্তুতি করিতে, বিজ্ঞানের অসীম পাশবিক বল ও ধর্ম্মবিরোধী ধর্ম্ম-ইতিহাস প্রচার করিতে গবর্ণমেণ্ট লাগিয়া যান।

তারপর আরো ৪ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ১৯২৯ সালের এপ্রিলের

খবর এই যে, গবর্ণমেণ্ট হইতে ধর্ম্ম-বিতাড়নের জবর চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। ধর্ম্ম-যাজকদিগকে মারিয়াও মারা যাইতেছে না। তাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। মঠও নাই, মন্দিরের সম্পত্তিও নাই। ইহার ফলে ভোগ-পরায়ণ মোহান্তরা অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু ভক্ত ত্যাগী সন্ন্যাসী অধিকতর কার্য্য করিতে পারিতেছেন। তাঁহারা দরিদ্র হইয়া দরিদ্রের অন্ন ভাগ করিয়া লইয়া দরিদ্রকে প্রেম, শ্রদ্ধা ও ঈশ্বরানুভূতির অমৃত-স্পর্শ দিতেছেন। দেখা যায় যে, সোভিয়েটের ধর্ম্ম-বিতাড়নের সূক্ষ্ম চেষ্টাতেও ফল হয় নাই বলিয়াই নূতন আইন করিয়া ধর্ম্মকে দাবাইবার জন্য আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। ত্যাগী সন্ন্যাসীদের তুষ্ট প্রভাব বন্ধ করার জন্য, তাঁহাদিগকে সমাজ-সেবা হইতে বঞ্চিত করার জন্য আইন হইয়াছে যে, ধার্ম্মিক প্রতিষ্ঠান-সমূহ স্কুল অথবা লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না। ধর্ম্মযাজকেরা জন-হিতকর আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির কাজেও হাত দিতে পারিবেন না। কথাটা অবিশ্বাস্য হইলেও রাশিয়ার গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে ধারাবাহিক রূপে ধর্ম্ম-উৎপাটন কার্য্য চালাইতেছেন তাহার সহিত এই প্রকার আইনের অসঙ্গতি নাই। যাহাদের বয়স ১৮ বৎসরের কম তাহাদের পক্ষে কোনও ধর্ম্মশিক্ষালয়ে যাওয়া অবৈধ ছিল। এক্ষণে ধর্ম্মযাজকদিগকে সমাজ-সেবা হইতেও বঞ্চিত করা হইল। তাহা হউক, সোভিয়েট রাশিয়া ধর্ম্ম বিতাড়নের জন্য যতই আইন করুন, তাহাতে শঙ্কিত হওয়ার কারণ নাই।

যিশুখৃষ্টকে যখন ক্রুশ-বিদ্ধ করা হইয়াছিল তখন তাঁহার স্বজাতীয়েরা বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে-পিতার কথা তিনি বলিয়া থাকেন,

সেই পিতা এইবার যিশুকে রক্ষা করুন। সে পিতা যিশুর নশ্বর দেহকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচান নাই—যিশুর প্রেম-ধর্ম্মকে বাঁচাইয়াছিলেন। যিশুর মৃত্যু দ্বারা খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সোভিয়েটের ধর্ম্ম-বিতাড়নের চেষ্টায় রাশিয়া যে সত্যসত্যই ধর্ম্মপরায়ণ হইতেছে ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই হেতু এই নির্য্যাতন কেবল সহনীয়ই নহে, তাহা কাম্যও বটে।

সোভিয়েট কি করিতেছেন? ষ্টেটকে অবিমিশ্রিত শ্রদ্ধা দ্বারা নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী সেবা করিতেছেন। ষ্টেট-যন্ত্রের প্রতি অবিকৃত শ্রদ্ধা দ্বারা ষ্টেটকেই ধর্ম্ম করিয়া তুলিতেছেন। ষ্টেটের ভিতর দিয়াই তামসিক উপায়ে তাঁহাদের ঈশ্বরোপসনা চলিতেছে। একথা কিছু নূতন নয়। আমাদের মনগড়া দেবতারই আমরা পূজা করিয়া আসিতেছি।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং ॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান হি তান্ ॥

"নিজ নিজ কামনার বশীভূত হইয়া নিজ নিজ নিয়ম আচরণ পূর্ব্বক স্বকীয় প্রকৃতির বশীভূত হইয়া মানুষ অন্য ক্ষুদ্র দেবতাগণের ভজনা করে। যে যে ভক্ত যে মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অর্চ্চনা করে আমি সেই সেই ভক্তের সেই সেই বিষয়ের শ্রদ্ধাই দৃঢ় করিয়া থাকি।"

ভগবানই ষ্টেটের প্রতি অচল শ্রদ্ধা সোভিয়েট-শাসক-মণ্ডলীকে দিতেছেন। যদি কাল ক্রমে ষ্টেট্ সভ্য হয়, তবে পাপ ও পশুবল দূর হইবে। পশুবল নির্মুক্ত হইলে ঐ সোভিয়েট্-ষ্টেট দ্বারাই ধর্ম্ম-রাজ্য সুদৃঢ়-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট আজ যে কৌশলে ধর্ম্ম-বিতাড়নের চেষ্টা করিতেছে, ব্যর্থতা দ্বারা সেই কৌশলই ষ্টেটকে ধার্ম্মিক করিয়া তুলিবে। অনেকটা ইতিমধ্যেই করিয়াছে। ধর্ম্মের ব্যঙ্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়াও ইহার প্রমাণ। সোভিয়েট বা বোল-সেভিক আজ বলেরই পূজক। তথাপি মূলে যে বোলশেভিকের দুর্ব্বলতা আছে তাহাও স্বীকার্য্য। নিরীহ ধর্ম্মযাজকদিগকে এখনো রাশিয়ার ষ্টেট যমের মত ভয় করে, সেই জন্যই তাহাদিগকে নির্য্যাতিতও করে। নিজে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া সোভিয়েট রাশিয়া মনে করে জগৎকে শান্তি ও সাম্য দিবে। ভীতজনের শান্তি ও সাম্য দিবার অধিকার কোথায়? জগৎটাকে সোভিয়েট তাহার বৈঠকখানার মত ছোট মনে করে—ভাবে মজুর ক্ষ্যাপাইলেই সারা জগতে বোলশেভিকের শান্তি ও সাম্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইবে। তাহার উদ্দেশ্য সাধু কিন্তু পথ মলিন। শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংঘর্ষ অর্থাৎ ঝগড়া বাধাইয়াই সে সাম্য আনিতে চায়। প্রেম দ্বারা এক করার ক্ষমতা নাই, সেই হেতু ঝগড়া ও লড়াই দ্বারা গায়ের জোরেই একাকার করা বোলশেভিকের পথ।

ভারতবর্ষকে কি লেনিন্-ষ্ট্যালিনের দল বোলশেভিক করিবে? না টলষ্টয় প্রমুখ যে ঋষিগণ রাশিয়ায় তপস্যা করিয়া গিয়াছেন, আজো নির্ব্বাসিত হইয়া রাশিয়ার মঙ্গলের জন্য যাঁহাদের তপশ্চর্য্যা চলিতেছে, রাশিয়ার যে মলোকান সম্প্রদায়-ভুক্ত লোকগণ প্রেমের ও অহিংসার পথে চলার সঙ্কল্প-

বশতঃ চিরনির্য্যাতন বরণ করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের রাশিয়া ভগবৎ বিশ্বাসে ও প্রেমে ভারতবর্ষের সহিত যোগযুক্ত হইয়া গান্ধীজীর অহিংস-মন্ত্র গ্রহণ করিবে ?

এ কথা স্মরণ রাখা দরকার, বোলশেভিক রাশিয়াই রাশিয়ার জন-সাধারণের নহে। যেমন রাশিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্রাটই রাশিয়ার জন-সাধারণ প্রতিভূ ছিলেন না, তেমনি এখনকার সোভিয়েটও রাশিয়ার সাধারণের প্রতিভূ নহেন। একদল ক্ষমতাশালী লোক রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া নিজেদের খেয়াল মত বিরোধী দলকে নষ্ট করিয়া, নির্ব্বাসিত করিয়া, কবি ও জ্ঞান-গুরুদিগকে অনেক স্থলেই অপমানিত করিয়া নিজেদের গর্ব্বান্ধ শাসন-যন্ত্র পরিচালিত করিতেছেন। কিন্তু রাশিয়ার জন-সাধারণ ইহা হইতে সম্পূর্ণ ই ভিন্ন প্রকৃতির। রাশিয়ানরা এখনো ইউরোপিয়ান হয় নাই। তাহারা এশিয়াটিক ত বটেই, তাহাদের অন্তর একেবারেই ভারতীয়দের মত। ধর্ম্ম বিশ্বাসে, শান্তি প্রিয়তায়, অত্যাচার সহনে ভারত ও রাশিয়ার একত্ব চিন্তাশীল ব্যক্তিরা স্বীকার করিয়া থাকেন।

গান্ধী ও টলষ্টয়ের, ভারত ও রাশিয়ার ভগবৎমুখী ভাব-ধারার গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমই সোভিয়েটের ধর্ম্ম-বিড়াতন চেষ্টার পরিণতি নহে ত ? রাশিয়াকে লেনিন জাগ্রত করিয়াছেন, গান্ধী তাহাকে সত্যের পথে, কর্ম্মের পথে পরিচালিত করিবেন।

ন্যায্য-মূল্য

দ্রব্য উৎপাদন করিবার ও ক্রেতার উপযোগী করিয়া বাজারে আনিবার জন্ত যে ব্যয় হয় তাহাই সেই পণ্যের মূল্য। এই মুল্য অপেক্ষা পণ্য যদি অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় তাহা যেমন অহিতকর তেমনি ইহা অপেক্ষা কম মূল্যে কোনও দ্রব্য বিক্রীত হইলে তাহাও তেমনি অহিতকর। অধিক মূল্যের বিক্রয়ের অহিত সহজে চোখে পড়ে। পাছে অধিক মূল্যে ক্রয় করা হয় এজন্ম ক্রেতা জাগ্রত ও স্বভাবতঃই সাবধান হইয়া আছে। এ বিষয়ে সতর্ক করার আবশুক নাই। পরন্তু ন্যায্য অপেক্ষা কম মূল্যে অর্থাৎ অন্যায্য সস্তায় পণ্য পাওয়ায় কাহারও উদ্বেগ দেখা যায় না। কিন্তু ইহাতেও উদ্বিগ্ন হওয়ার হেতু আছে। সতর্ক হইয়া কোনও কোনও পণ্য সস্তা বলিয়াই পরিহার করা দরকার। ভেজালের ভয়ে নহে, খাঁটি দ্রব্যও ন্যায্য-মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে পাওয়ায় বিপদ আছে। ন্যায্য-মূল্য কাহাকে বলে এই প্রসঙ্গে তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে।

একই পণ্যের উৎপাদন খরচা সর্ব্বত্র সমান পড়ে না। বাংলায় এক মণ ধান ৪৲ টাকায় উৎপন্ন হয়—উহাই উহার ন্যায্য-মূল্য। মাদ্রাজে হয়ত তাহাই ৩৷৷০ টাকায় উৎপন্ন হয়, এবং মাদ্রাজে তাহাই তাহার ন্যায্য-মূল্য। সেই হেতু প্রতি দ্রব্যের জন্যই স্থান বিশেষে মূল্য বিভিন্ন। রেল ও নৌপথে সহজে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে মাল যাইতে পারে। কাজেই যে দ্রব্যের এক স্থানে ন্যায্য-মূল্য কম, সেই দ্রব্য অপর স্থানে

নীত হইয়া স্থানীয় দ্রব্যের তুলনায় সস্তায় বিক্রয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর যদি সেই প্রকার হয় তাহা হইলেই প্রতিযোগিতা হইল। এই প্রতিযোগিতার উপরই ব্যবসা চলিতেছে। সস্তার বাজারে কিনিয়া আক্রার বাজারে বিক্রয় করা ব্যবসায়ীদিগের কাজ। যতক্ষণ দুই স্থানের মধ্যে বিভিন্ন পণ্যে সস্তা-আক্রার পাল্টা-পাল্টি হয় ততক্ষণ ইহা সুস্থ ব্যবসা থাকে। কিন্তু যখনই ইহা এক রোখা হইয়া এক দিক হইতে সস্তা পণ্য যায়, অথচ অপর দিক হইতে সস্তা পণ্য না আসে, তখন এই ব্যবসা অস্বাস্থ্যকর হইয়া দেশবাসীর শ্বাস রোধ করিতে পারে। এই রকম শ্বাস রোধের বিপদ হইতে রক্ষা করিবার অস্ত্র রাজা নিজের হাতে রাখেন।

অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইলে রাজা শুল্ক বসাইয়া, নিষেধ আজ্ঞা দিয়া ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রজাকে সুস্থ থাকিতে দেন। কিন্তু রাজা যদি কোনও ব্যবসায়ীর পক্ষ গ্রহণ করেন তখন প্রজার দুর্দ্দশা আরম্ভ হয়। ন্যায্য-মূল্যের বিবেচনা অন্তর্হিত হয়।

আমাদের দেশে এখন তাহাই হইতেছে। বস্ত্রের ন্যায্য-মূল্য ছিল সূতা কাটিয়া বুনিতে যে ব্যয় হয় তাহাই। সূতা কাটিতে ও বুনিতে যাহারা নিযুক্ত তাহাদের অংশতঃ গৌণ ও প্রধান উপজীবিকা হিসাবে ঐ কর্ম্ম হইতে যতটা ভরণ-পোষণের সংস্থান হয় তদুপরি তুলা ইত্যাদির দামই বস্ত্রের ন্যায্য-মূল্য। ইংরাজ বণিকগণ কখনও কখনও এই ন্যায্য-মূল্য দিয়া বস্ত্র কিনিয়া বিলাতে লইয়া বিক্রয় করিত, আবার অনেক স্থলে বলপূর্ব্বক অন্যায্য সস্তায় বস্ত্র কিনিয়া বিলাতে পাঠাইয়া ব্যবসা করিত। সেদিন গিয়াছে। বিলাতে কাপড়ের কল বসাইয়া ইংরাজেরা বিলাত হইতেই এদেশে বস্ত্র পাঠাইতেছে এবং উহা অন্যায্য মূল্যেই পাঠাইতেছে

—যে মূল্যে এ দেশে বস্ত্র জন্মে তদপেক্ষা কম মূল্যে পাঠাইতেছে। দেশী কলওয়ালারাও কলের সাহায্যে বস্ত্র তৈয়ার করিয়া অন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করিতেছে। সস্তায় বিক্রয় করিতেছে; কিন্তু সস্তা হইলেও ইহা অন্যায্য মূল্য। সস্তা পাওয়ায় ব্যক্তিগত ক্রেতার সুবিধা বলিয়া অনেকেই এই অন্যায়ের অন্যায়ত্ব দেখিতে পান না। যদি ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্পে-নিযুক্ত লোক অন্য কোনও দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বস্ত্রের সমপরিমাণ ব্যবসা বিলাতের সহিত করিতে পারিত তাহা হইলে এই বিদেশী বস্ত্রের ব্যবসা ও বস্ত্রের সস্তা দাম ন্যায্য বলা যাইত। যতক্ষণ তাহা না হইতেছে ততক্ষণ ইহা অন্যায়। তেমনি দেশী মিলওয়ালারা যে সকল গ্রাম্য লোককে বস্ত্র বিক্রয় করেন সেই সকলের বস্ত্র উৎপাদনের শ্রম যদি অন্য কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারিতেন তাহা হইলে দেশী মিলের বস্ত্রের ব্যবসা ন্যায্য ব্যবসা ও তাহার মূল্য ন্যায্য-মূল্য হইত। কিন্তু আজকার অবস্থায় ইহাও—এই দেশী মিলের বস্ত্র ব্যবসায়ও অন্যায় ব্যবসায়। যে সময় চরখায় দেওয়া যায় সেই সময় অন্য কোনও জিনিষে নিযুক্ত করা যতটা কঠিন—বস্ত্র শিল্পের পরিবর্ত্তে অন্য শিল্প গৃহস্থের জন্য আবিষ্কার করাও ততটা কঠিন। এই অন্যায়ের দিকে আজকালকার সভ্যতার দৃষ্টি নাই। আধুনিক সভ্যতা সেই হেতু প্রভূত ধন-রাশি একস্থানে পুঞ্জীভূত করিয়া অন্যত্র অসংখ্য লোককে নিরন্ন রাখিয়াছে; এক জাতি অপর জাতির উপর এই অন্যায় ব্যবসায় চাপাইয়া দিয়া তাহার মরণান্ত করিতেছে।

সস্তা বলিয়াই যে কোন আবশ্যকীয় পণ্য কিনিতে নাই এ কথা বুঝানো শক্ত। দ্রব্যের সস্তা মূল্য যে উহার অন্যায় মূল্য হইতে পারে,

উহা কিনিয়া ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ বজায় থাকিতে পারে কিন্তু সমষ্টির যে হানি হইতে পারে ইহা সাধারণ ভাবিতে ইচ্ছা করে না। ধরা যাউক, আজ বাংলা দেশে যে চাউলের ন্যায্য-মূল্য ৬৲ মণ তাহা যদি যাভা হইতে ৩৲ মণ দরে আসিতে আরম্ভ করে তবে আমরা কি করিব? মধ্যবিত্ত ভদ্রেরাই বা কি করিবে, আর চাষারাই বা কি করিবে? যদি মধ্যবিত্ত ভদ্র-সম্প্রদায় ইহা কিনিতে আরম্ভ করে তবে বেশ দিন কতক হয়ত তাঁহাদের স্বস্তি বোধ হইবে। যাভা চিনি যেমন সস্তা, যাভা চাউলও তেমনি সস্তা হইল বলিয়া দিন কতক ভদ্রেরা আনন্দ করিবেন। চাষীরা দেখিবে যে ধান চাষ করা আর পোষায় না। যে চাউল উৎপাদন করিতে ৬৲ টাকা পড়ে, তাহা যদি ৩৲ টাকা মণ দরে কিনিতে পায় তবে তাহা উৎপন্ন করিয়াও লোকসান, বিক্রয় করিতে পারিবে না। নিজের আবশ্যক মত উৎপাদন করিবার আগ্রহ থাকিবে না, ধানের পরিবর্ত্তে পাট ইত্যাদি বপন করিবারই চেষ্টা হইবে—পাট বুনিয়া টাকা পাইবে, তাহা দ্বারা সস্তা চাউল কিনিবে এই লোভে! যদি তাহাই বস্তুতঃ করে তবে অচিরেই বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। পাট কত বুনিবে? চাহিদার বেশী উৎপন্ন করিলে তখন উহার মূল্য নামিয়া যাইবে—আর লাভ থাকিবে না। পাট উৎপাদনও বন্ধ করিতে হইবে।

আসল কথা শ্রমের মূল্য দিয়াই আমরা আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া থাকি। যদি শ্রম করিবার সুযোগ না থাকে, বাংলা দেশে পল্লীবাসীর শ্রম করিবার প্রধান উপায় যে ধানের চাষ সেই ধানের চাষ যদি বন্ধ হয়, আর চাহিদার অভাবে পাট ইত্যাদি কৃষিজাত অন্য দ্রব্য চাষ করা

অসম্ভব হয়, তাহা হইলে কৃষক বসিয়া বসিয়াই মরিবে—৩৲ টাকা মণের চাউল বাজারে থাকিতেও কৃষকেরা মরিবে। ভদ্রলোকেরাও কৃষকের শ্রমলব্ধ উপার্জ্জনের অংশ গ্রহণ করে বলিয়া তাঁহাদিগকেও ক্রমে অনাহারে প্রাণ দিতে হইবে, তা বাজারে যতই ৩৲ টাকা দামের চাউল থাকুক না কেন।

যদি দেশের লোকের সুবুদ্ধি হয়, তবে মৃত্যু ঠেকাইবার জন্য ৩৲ মূল্যের যাভা-চাউলকে সকলেই বিষবৎ ত্যাগ করিবে ও ৬৲ টাকা মূল্যের দেশী চাউলই কিনিবে। সস্তার জিনিষ কেমন করিয়া আমাদিগকে মারিয়া ফেলিতে পারে তাহা চাউলের দৃষ্টান্তে দেখানো হইল। চাউলে ইহা এতাবৎ হয় নাই, কিন্তু বস্ত্রে ইহাই হইয়াছে। চরখার বস্ত্র-শিল্পে যে শ্রম নিয়োজিত হইত অন্যায্য মূল্যে বস্ত্র বিক্রয় হওয়ায় সে শ্রম করিবার পথ বন্ধ হইয়াছে। পণ্ডিতেরা ও চাষীরা উভয়েই মূর্খের ন্যায় শ্রম-দান-কারী শিল্প ত্যাগ করিয়া অন্যায় ব্যবসায়ের প্রশ্রয় দিতেছেন। এই অন্যায় সমর্থনের জন্য industrialism বা ব্যাপক পণ্য উৎপাদন, age of machinery বা যন্ত্র-যুগ ইত্যাদি শুষ্ক মতবাদের আবৃত্তি জগৎময় চলিতেছে। কিন্তু এ সকলের পশ্চাতে আছে কেবল ব্যক্তির বিপুল স্বার্থ। এই ব্যাপার গান্ধীজীর নিকট ধরা পড়িয়াছে। এই মোহ দূর করাই তিনি জীবনের অন্যতম প্রধান কার্য্য বলিয়া আজ দশ বৎসর প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতেছেন।

কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই মানুষ বাঁচে—একথা দেশ-বিদেশের রাজ-নৈতিকেরা যেন ভুলিয়াই গিয়াছেন। নিজে নিষ্কর্ম্মা হইয়া হয় কল দ্বারা না হয় দাম দ্বারা কর্ম্ম করাইয়া লওয়ার নিতান্ত তামসিক আদর্শের

পশ্চাতে সভ্য জগৎ ঘূর্ণায়মান। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "যজ্ঞকর্ম্ম সহিত প্রজা সৃষ্টি হইয়াছে," "নিয়ত তুমি কর্ম্ম করিবে।" "জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" আবার নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি'

"ত্রিভুবনে আমার করণীয় কিছু নাই, অপ্রাপ্ত অথচ প্রাপ্তব্য এমন কিছুও নাই, তথাপি আমি কর্ম্মই করিয়া যাই। কেবল কর্ম্মের জন্যই কর্ম্ম করার কথা যিশু খৃষ্টের উপদেশেও পাওয়া যায়, যথা ঃ—

"একজন লোক তাহার আঙ্গুর ক্ষেত্রের জন্য মজুর নিযুক্ত করিতে-ছিলেন। প্রাতে এক দল লোককে ঐ কার্য্যে নির্দ্দিষ্ট হারে নিযুক্ত করেন, পূর্ব্বাহ্ণে বাহিরে গিয়া দেখেন তখনও কতক লোক কর্ম্ম না পাইয়া বসিয়া আছে; তাহাদিগকেও তিনি সে দিনের কর্ম্মে নিয়োগ করেন। দু'প্রহরেও তিনি বাহিরে আসেন, পরে অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যার সময়ও বাহিরে আসিয়া ঐরূপ লোক দেখেন ও কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দেন। যখন দিনান্তে উহাদিগকে, মজুরী দিয়া বিদায় করার সময় হইল তখন সকলকেই সমান অর্থাৎ সারা দিনের মজুরী দিয়া দিলেন। যাহারা পূর্ব্বে আসিয়াছিল তাহারা এই সমতায় অসন্তুষ্ট হওয়াতে নিয়োগ-কর্ত্তা বলিলেন যে, নিজের প্রাপ্য যদি বুঝিয়া পাইয়াছ তবে অপরের প্রাপ্য সম্বন্ধে হিংসা না করিয়া প্রস্থান কর।" ম্যাথু ২০।১—১৬। এই গল্প দ্বারা যিশু ইহাই বুঝাইয়াছেন যে, কর্ম্ম করার

সৌভাগ্যই পরম সৌভাগ্য, উহা দ্বারা কতটা উপার্জ্জন হইল তাহা প্রধান বিষয় নহে।

এমনি ধারা কর্ম্ম যে জিনিষ তাহা যিনি দরিদ্রের গৃহে যোগান তিনি শ্লাঘ্য। এই কর্ম্ম করিবার অবকাশ যে যন্ত্র ও যে যন্ত্র-স্রষ্টা নাশ করে অথচ তৎপরিবর্ত্তে অন্য কর্ম্ম ক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে পারে না সে জগতের পীড়া উৎপাদন করে।

উপরোক্ত বিবৃতি হইতে খদ্দর ব্যবহারের ধর্ম্ম্য-ভাব সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। খদ্দর শ্লাঘ্য, কেন না ইহা আমাদের নিকট শ্রমের পসরা খুলিয়া দিয়াছে। খদ্দরের কোন মূল্যই মহার্ঘ্য নহে, খদ্দরের আজ যে মূল্য উহাই বস্ত্রের ন্যায্য মূল্য।

হিন্দু-মুসলমান

হিন্দুর সহিত মুসলমানের প্রথম সংঘাতে ভারতের বিষম পীড়া উপস্থিত হইয়াছিল। মুসলমানেরা লুণ্ঠন করিতে আসিয়া প্রথমে কেবল লুণ্ঠন করিয়াই ফিরিয়া যাইতেন। পরে আসিয়া রাজ্য জয় করিয়া বসিয়া যান। তখন হইতেই হাওয়া ফিরিতে থাকে। মুসলমান-শাসন ভারতীয়ের দ্বারাই ভারত-শাসন ব্যাপার। উহা বৈরাজ্য ছিল না, ভারতবর্ষ হইতে ধন-রত্ন অন্তর্হিত হইত না। পরন্তু মুসলমান শাসকদের পরম প্রযত্ন ছিল যাহাতে ভারতের শ্রীবৃদ্ধি হয়, বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। মুসলমান শাসকগণ ভারতবাসী হইয়া ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য দিন দিন গ্রহণ করিতেছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান দুই বিভিন্ন ধর্ম্মও আচার মাত্র। কিন্তু উভয়ের ভিতর প্রতিবেশীর ঐক্য ক্রমশঃ অধিকতর সংঘটিত হইতেছিল। ইউরোপীয়েরা এদেশে যখন বাণিজ্যের জন্য আসে তখন মোগল-শাসন চলিতেছিল। মোগল দরবারের অনুগ্রহেই ইংরাজেরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার, যেখানে ইচ্ছা ত্রিশ বিঘা করিয়া জমি লইয়া কুঠি বসাইবার অধিকার লাভ করিয়াছিল। তারপর নানা দলাদলির ভিতর ইংরাজ বণিকেরা কখনো এক পক্ষ, কখনো অপর পক্ষের অর্থে তাহাদিগকে পরস্পর যুদ্ধ করিতে সাহায্য করিয়া ক্রমশঃ ক্রমশঃ সিংহাসনে বসিয়া পড়ে। এই বসিয়া পড়ার ব্যাপার স্থায়ী করিবার জন্য হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ রাখা নিতান্ত আবশ্যক। সেই হেতুই হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ আছে, নচেৎ মূলে

উভয়ের ভিতর বিরোধের কোনই কারণ নাই। হিন্দুস্থান যেমন প্রাচীন দেশ, হিন্দুজাতি তেমনি প্রাচীন জাতি। বহু জাতির সংমিশ্রণে হিন্দুজাতি গঠিত, তাহাদের সকলের সভ্যতা এক প্রকার ছিল না, ধর্ম্ম-বিশ্বাস এক প্রকার ছিল না, তাহাদের আচার-ব্যবহারও এক প্রকার ছিল না। কিন্তু তবুও তাহারা এক হইয়া গিয়াছিল। মুসলমানদিগের লৌকিক ধর্ম্ম হয়ত দীর্ঘকাল পরেও ভিন্নই থাকিত, কিন্তু শাশ্বত-ধর্ম্ম, যেখানে মানুষে মানুষে ভেদ নাই সেখানে প্রতিবাসীর প্রেমে দেশগত ভাষাগত ও ভাবগত ঐক্যে তাঁহারা যে নিশ্চয়ই এক হইয়া যাইতেন তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। হিন্দু ধর্ম্মের উদারতা এমন বিশ্বব্যাপী যে, বহু সংখ্যক লোক হিন্দু থাকিলেও অল্প সংখ্যক মুসলমানের নিরঙ্কুশ হইয়া থাকিতে কোনই বাধা হইতে পারিত না।

আজ হয়ত এবম্বিধ বিশ্বাস বহন করা হিন্দুর ও মুসলমানের পক্ষে শক্ত। বৈরাজ্য হেতু উভয়ের বিরোধ এত বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, পরস্পরের শুভ ইচ্ছায় বিশ্বাস অবাস্তব বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই অবস্থাই অস্বাভাবিক। এই সন্দেহ, বিরাগ ও বিদ্বেষ যাহা পরস্পরের মধ্যে আজ বিরাজমান তাহা স্বাভাবিক অবস্থায় পুনরায় সহজেই লুপ্ত হইবে। আজকাল এমন হইয়াছে যে, মুসলমান বলিতে অনেক হিন্দুর মনে মুসলমানের মধ্যে যাহারা অধম তাহাদের চিত্রই জাগিয়া উঠে। বোধকরি মুসলমানেরাও মনের মধ্যে হিন্দু সম্বন্ধে এই প্রকার ধারণাই পোষণ করেন। কিন্তু কেন এমন হইবে? যাহাকে না ভালবাসি তাহার সমস্তই কুৎসিৎ দেখি। মুসলমানের ধর্ম্ম-বিশ্বাসই এমন যে; মুসলমানগণকে হিন্দুদ্বেষী হইতেই হইবে—এমন কোনও

কোনও হিন্দু বিশ্বাস করেন। কোনও মুসলমান যে হিন্দু সম্বন্ধেও ইহার বিপরীত মনে না করেন তাহাও নহে। কিন্তু মোহম্মদের জীবন-ঘটিত ঘটনায় এমন মৃদুতা ও প্রেমের পরিচয় পাই যে, তাঁহার নামের সহিত অপ্রেম ও বিদ্বেষ জড়ানো নিতান্তই ভিত্তিহীন নির্ম্মমতা।

যখন মোহাম্মদের অনুবর্ত্তীগণের প্রতি তাঁহার স্বজাতীর কোরাইশ-সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল তখন কোরাইশদের অত্যাচার হইতে বাঁচাইবার জন্য অনুচরদিগকে তিনি অদূরবর্ত্তী অ্যাবিসিনিয়া দেশস্থ খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী রাজার রাজ্যে পাঠাইয়া দেন। সেখানে অপর ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি উদারতা প্রদর্শিত হইত। কোরাইশেরা এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই রাজার নিকট দূত প্রেরণ করেন এবং এই পলাতকদিগের আত্ম-সমর্পণ প্রার্থনা করেন। তাহাদিগকে নিহত করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাহাদের অপরাধের সম্বন্ধে বলেন যে, তাহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে। রাজা আশ্রিতদিগকে আহ্বান করিয়া প্রশ্ন করেন যে, "কি সে তোমাদের ধর্ম্ম যাহার জন্য তোমরা পুরাতন ধর্ম্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছ?" আশ্রিতদিগের মুখপাত্র স্বরূপ জাফর বলেন, "হে রাজন্! আমরা গভীরতম অজ্ঞতায় ও বর্ব্বরতায় ডুবিয়াছিলাম, আমরা দেবতার মূর্ত্তি পূজা করিতাম, আমরা ব্যভিচারীর জীবন যাপন করিতাম, আমরা মৃত জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিতাম এবং আমরা কদর্য্য বাক্য উচ্চারণ করিতাম, আমরা মনুষ্যত্বের সমস্ত শ্রেষ্ঠ অনুভূতি অগ্রাহ্য করিতাম, আমারা আতিথেয়তা ও প্রতিবেশীর প্রতি ভ্রাতৃত্ব-বোধ শূন্য ছিলাম, আমরা একমাত্র বল-প্রয়োগের নীতি ছাড়া আর কোনও রীতি জানিতাম না। এমন সময় ঈশ্বর আমাদের মধ্যে এমন এক

জনের উদ্ভব করিলেন যাঁহার জন্মের কথা এবং যাঁহার সত্যবাদিতা, সততা ও পবিত্রতার কথা আমরা জানিতাম। তিনি আমাদিগকে ঈশ্বরের একত্বের বিষয় শুনাইয়াছেন, এবং অন্য কিছুতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি মূর্ত্তি পূজা নিষেধ করিয়াছেন, এবং আমাদের প্রতি এই অনুজ্ঞা করিয়াছেন, যেন আমরা সত্যবাদী হই, যেন আমরা আমাদের প্রতি ন্যস্ত-বিশ্বাস ভঙ্গ না করি, আমরা যেন স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কুবাক্য না বলি, আমরা যেন অনাথের বিত্ত অপহরণ না করি। তিনি আদেশ করিয়াছেন, যেন আমরা পাপকে দূরে রাখি, অন্যায় পরিহার করি, যেন ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, দীন জনে দান করি, এবং উপবাস ব্রত রক্ষা করি। আমরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি এবং এই জন্য আমাদের প্রতিবেশীদিগের ক্রোধ-ভাজন হইয়াছি।"

কেবল মূর্ত্তিপূজার কথা বাদ দিলে মোহম্মদের এই উপদেশ সর্ব্বাংশেই হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্মত। মূর্ত্তিপূজার কথা পরে বলিতেছি। জাফরের এই উক্তিতে একটি কথা যাহা মোহম্মদ বলিয়াছেন তাহাতেই ইস্‌লামকে শাশ্বত-ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলে! "We knew no law, but that of the strong"—"আমরা বল-প্রয়োগ নীতি ছাড়া আর কোনও নীতি জানিতাম না।" বল-প্রয়োগ নীতি পরিহার করিতেই ইস্‌লাম মুসলমানকে শিক্ষা দেয়। আজ সমস্ত সমাজই বল-প্রয়োগ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এক একজন মহামানব আসেন, তাঁহারা মানুষকে দেবত্ব দান করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন, বল-প্রয়োগের নীতি পরিহার করিয়া প্রেম-প্রয়োগের নীতি অবলম্বন করিতে

বলেন। বল-প্রয়োগ নীতি পাশবিক—মনুষ্যেতর সকল জন্তুই ঐ নীতি দ্বারা নিজেদিগকে পরিচালিত করে। কেবল মানুষকেই ঈশ্বর অন্য বলের অর্থাৎ আধ্যাত্ম বলের আস্বাদ দিয়াছেন। যিনি যে পরিমাণে বল-প্রয়োগ নীতি পরিহার করেন তিনি সেই পরিমাণে মানুষের ভিতর দেবত্ব আনয়ন করেন। আমাদের ধর্ম্ম-গুরুগণ, যাঁহাদের নামে আমরা নিজদিগকে বৌদ্ধ, হিন্দু, খৃষ্টান বা মুসলমান বলিয়া অভিহিত করি, তাঁহারা সকলেই এই বল-প্রয়োগ নীতি অপকৃষ্ট ও পাশবিক জ্ঞানে পরিহার করিতে বলিয়াছেন। যিশু বলিয়াছেন—"পুরাণো ধর্ম্ম-নিয়মে আছে, 'চক্ষুর বদলে চক্ষু লইবে দাঁতের বদলে দাঁত লইবে'। কিন্তু আমি তোমাকে বলি যে, অন্যায় দ্বারা অন্যায়ের শোধ দিও না।" আজ হইতে ১৯ শত বৎসর পূর্ব্বে যিশু খৃষ্ট যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা গির্জ্জায় গির্জ্জায় উচ্চারিত হইতেছে, কোটি কোটি ধর্ম্ম পুস্তকে মুদ্রিত ও গঠিত হইতেছে কিন্তু সমাজ-হৃদয়ে আজিও তাহা মুদ্রিত হয় নাই। মোহম্মদও ১৩শ বৎসর পূর্ব্বে সেই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহাও তেমনি তাঁহার ধর্ম্মমতে বিশ্বাসীগণ সমাজে স্থান দেন নাই। দিলে ভূতলে স্বর্গ-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইত। বল-প্রয়োগ নীতির পরিহার মানে—সমাজ হইতে শান্তি তিরোহিত করণ এবং তাহার সাথে সাথেই প্রত্যেককে আর্থিক সাম্যাবস্থায় আনয়ন। এক্ষণে এই বিষয়ে অধিক আলোচনা না করিয়া মূর্ত্তিপূজার বিষয় বিচার করিব।

মোহম্মদ মূর্ত্তিপূজা নিষেধ করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বল-প্রয়োগ নীতিও পরিহার করিতে বলিয়াছেন। নিজে মূর্ত্তিপূজা না করিলেই

হইল, কিন্তু অপর কেহ পূজা করিলে চড়াও হইয়া তাহার বাড়ীতে গিয়া সে মূর্ত্তি নষ্ট করিতে বলেন নাই। বরঞ্চ ঐ কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেই বলিয়াছেন—কেন না উহা বল-প্রয়োগ করা। কার্য্যতঃ মুসলমান এই নীতি ভঙ্গ করিয়া বলপূর্ব্বক মূর্ত্তি-পূজকদিগকে দণ্ড দিতে একাধিকবার উদ্যত হইয়াছেন। মুসলমানের চক্ষে হিন্দুরাও যেমন মূর্ত্তি-পূজক, খৃষ্টানেরাও তেমনি মূর্ত্তি-পূজক। অদৃষ্টের পরিহাস এমনি যে, যে-খৃষ্টানেরা আজ ভারতীয় হিন্দুদিগকে মূর্ত্তিপূজার জন্য নিন্দা করেন তাঁহারাই মূর্ত্তিপূজা করার দরুণ মুসলমান কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত ও নিষ্পিষ্ট হইয়াছিলেন। যিশুখৃষ্ট ও মেরীর ছবি ও মূর্ত্তি রাখা ও ক্রুশ ধারণ করা—এ সমস্তই মূর্ত্তিপূজা বলিয়া মুসলমানেরা খৃষ্টানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে এবং তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছে। ভারতবর্ষে আসিয়াও মুসলমানেরা কালাপাহাড়ী কাণ্ড করিয়া হিন্দুর সহিত অপ্রণয় করিয়াছেন। তাহা হইলেও আমি বলিব যে, ঐ কার্য্য হজরত মোহম্মদের শিক্ষার বিরোধী। মূর্ত্তিপূজার বিরোধ ত আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মেরা করেন এবং আর্য্য-সমাজীরাও অতিমাত্রায় করেন। তথাপি ইঁহারাও হিন্দু হইতে বিশেষ ভিন্ন নহেন এবং হিন্দুদের সহিত অচ্ছেদ্য প্রেমের সম্বন্ধে বদ্ধ। মুসলমানেরও তেমনিভাবে হিন্দুর সহিত প্রেমের সম্বন্ধে বদ্ধ হওয়ার বাধা মূর্ত্তিপূজার ভিতর নাই। মূর্ত্তিপূজা মুসলমান বা আর্য্যসমাজীরা যে দৃষ্টিতে দেখেন, হিন্দুরা তাহা দেখেন না। হিন্দু-ধর্ম্মের ভিতর যেমন মূর্ত্তিপূজা বা বৃক্ষপূজা স্থান পাইয়াছে, তেমনি উপনিষদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান অদ্বৈতবাদও স্থান পাইয়াছে। মূর্ত্তিপূজায় মূর্ত্তিকেই ঈশ্বর কোনও লোকই মনে করে না। ঈশ্বরকে কখনো

পিতারূপে, কখনো মাতারূপে, কখনো সখীরূপে ভক্তেরা আহ্বান করিয়া থাকেন। সেই আহ্বান মূর্ত্তিতে রূপ পায় এবং সেই রূপ চিত্তবৃত্তি একাগ্র করিবার সহায়ক হয়। কেবল মূর্ত্তি কেন, শিলার ন্যায় চিহ্ন দ্বারাও যেখানে ঈশ্বর অনুভূতির সাহায্য হয়, সেখানে তাহার প্রয়োজনীয়তাও প্রমাণ হইয়া যায়। ঈশ্বর দুর্জ্ঞেয়। যিনি যে ভাবেই তাঁহাকে ভাবুন, পরিপূর্ণ স্বরূপে তিনি মানুষ-বুদ্ধির অগম্য। এই অবস্থায় যদি কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কোনও সাহায্য অবলম্বনে তাঁহাকে ভাবিতে চেষ্টা করে তখনই অন্ততঃ এটুকু সে স্বীকার করে যে, এই জগৎ বৈচিত্রের একটা হেতু আছে যাহা ধরা-ছোঁয়া যায় না—যাহা আত্মাগত। হিন্দু এই ভাব পাইলেই সন্তুষ্ট।

এত বিচার করিয়া হিন্দু-মুসলমান মিল হইবার নহে। মিল হইলে এই বিচার অবলম্বনে তাহা আরো দৃঢ় হইতে পারে। এখন কেবল একথা স্মরণ করা দরকার যে, হিন্দু-মুসলমানে প্রেম গভীর হওয়ার কোনই বাধা নাই। যদি প্রেমের দৃষ্টিতে মুসলমানদিগকে দেখি তখন তাহার ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর শ্রদ্ধা আসিবে, তাহার আচার-আচরণ অর্থযুক্ত বোধ হইবে। মাথা মুড়াইলে ও লেংটি পরিলেও মানুষকে ভালবাসা যায়, নগ্নদেহ ও মুণ্ডিত মস্তকও কুশ্রী না ভাবিয়া স্বর্গীয় শোভা মণ্ডিত মনে করা যায়। তেমনি নেড়া মাথা করিলে এবং দাড়ি রাখিলে ও লুঙ্গী পড়িলেও সুন্দর দেখায়। সৌন্দর্য্য মনে—সত্যকার সৌন্দর্য্য হৃদয়ের পবিত্রতায়। উহা কোন পরিচ্ছদের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে না।

মুসলমানদের অনেক আচার হিন্দুদের নিকট খারাপ বোধ হয়—তেমনি হিন্দুদের অনেক আচরণ মুসলমানদিগের নিকট হেয় মনে হয়—

যেমন ধরুন অস্পৃশ্যতা। এ-গুলির জন্য একে অপরকে দোষ না দিয়া ধৈর্য্য সহকারে ভালবাসিতে থাকিলেই যাহার যাহা ময়লা আছে সাফ হইয়া যাইবে।

তুচ্ছ চাকুরীর কাড়াকাড়িতে, নির্ব্বাচনে কয়টী পদের কে অধিকারী হইবে, ইহা লইয়া বড় বড় বাক্-বিতণ্ডা ও ঝগড়া হয়। আমরা একই বিদেশী-শাসন-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। এমত অবস্থায় উভয় পক্ষই কে কত অপর পক্ষের জন্য ত্যাগ করিতে পারেন তাহার জন্যই প্রস্তুত হইতে হয়। হিন্দুরা সংখ্যায় অধিক, বিদ্যায় ও কলাচর্চ্চায় তাঁহারা অধিক অগ্রসর হইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদিগের সমস্ত ন্যায্য দাবী তাঁহাদিগকে দেয় এবং যাহাতে তাঁহাদের মন হইতে হিন্দুর সংখ্যাধিক্য জনিত ভীতি দূর হয় তজ্জন্য সর্ব্ব-প্রকারে তাঁহাদের স্বার্থ হিন্দু-স্বার্থ অপেক্ষা অধিক জ্ঞান করা দেশ-হিতাকাঙ্ক্ষী হিন্দু মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

বাংলায় নারী-হরণ লইয়া হিন্দু-মুসলমানে আন্তরিক একটি সংঘর্ষ বর্দ্ধিত হইতেছে। মুসলমান সমাজে হিন্দুনারী হরণকারীরা শাসিত হয় না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অপরাধীরা অভিনন্দিত হয়—এমনও দেখা যায়। এমত অবস্থায় হিন্দুর কর্ত্তব্য নিজ সমাজ শুদ্ধ করা। নিজে দুর্ব্বল হইলে যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউক, অপরাধী আসিয়া দেখা দিবে। নিজের দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। মাংসপেশী শক্ত হইলে আমি তাহাকে সবল বলি না। নারীর মান রাখিতে যে প্রাণ দিতে পারে,—তার শরীর কঙ্কালসার হউক না কেন; সেই নারী-হরণ বন্ধ করিতে পারে। আর যদি অপর পক্ষে মুসলমানগণ এই পাপ প্রশ্রয় দেন তবে তাঁহারা ক্রোধের পাত্র না হইয়া কৃপার পাত্র। তাঁহাদের সমাজ ঐ পাপে যে আঘাত পাইবে

তাহা হইতে সামলাইবার জন্য তাঁহাদের কাজ কিছু সহজ হইবে না। কিন্তু আমরা যেন অপরাধীর দণ্ড দিতে না চাই। ভালবাসা মানুষের কাজ—দণ্ড দেওয়ার কর্ত্তা একমাত্র ঈশ্বর। আমরা এক হিন্দু অপর হিন্দুর উপর যে পুরুষানুক্রমে অস্পৃশ্যতারূপ পাপ আচরণ করিয়া আসিতেছি—উহার দণ্ড ঐ কার্য্যই বহন করিয়া আনিয়াছে। বাহিরের দণ্ডে আবশ্যক হয় নাই। বাহিরের দণ্ডে উহা নিরোধও হইবে না। নিজ সমাজের পাপের কথা ভাবিলে হিন্দুরা সহজেই মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। যেমন হিন্দু-সমাজের পাপাচারীরাই হিন্দু-সমাজ নহে, তেমনি মুসলমান-সমাজের পাপাচারীরাই মুসলমান-সমাজ নহে। সঙ্গে সঙ্গে সাধু হিন্দু ও সাধু মুসলমানের চরিত্রের গৌরবে আমরা পরস্পরকে মর্য্যাদা করিতে শিক্ষা করিতে পারি এবং তাহার ফলে উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া যাইতে পারি।

ব্যায়াম চর্চ্চা

যুব-সম্মিলনী জাতীয় ভাব উদ্দীপনার ক্ষেত্র এবং যে সেবা-ভাব লইয়া যুবকেরা সম্মিলনীর কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন তাহা শ্লাঘ্য। যুব-সম্মিলনীর অধিবেশনে ব্যায়াম চর্চ্চা দেখানো স্বাভাবিক। লাঠি ও ছোরা খেলায় ছেলে-মেয়েরা কৃতিত্ব দেখায়। ছোট ছোট মেয়েরা যখন বিদ্যুৎবেগে ছোরা দ্বারা আক্রমণ ও আত্মরক্ষা করে তখন সমবেত মহিলাগণ ও জন-সাধারণ চমৎকৃত হ'ন। ইহার প্রয়োজনীয়তা খুবই আছে তাহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু কি সেই প্রয়োজনীয়তা তাহার বিচার আবশ্যক।

ছোরা বা লাঠি খেলায় দেহ শক্ত করে, কর্ম্মঠ ও শ্রম-সহিষ্ণু এবং চক্ষু কর্ণ হস্ত-পদাদিকে সচকিত করে। ইহার প্রত্যক্ষ আশুর প্রয়োজনীয়তা হইতেছে শত্রুকে নাশ করা, অপমানকারীকে দণ্ড দেওয়া। অপমানের আঘাত নারী-নির্য্যাতন রূপেই আসুক বা অন্য অত্যাচার রূপেই আসুক, সে আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় অমনি কায়িক শক্তি চর্চ্চার ঝোঁক উপস্থিত হয়, কায়িক শক্তি অর্জ্জনের আকাঙ্খায় ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।

শারীরিক শক্তি শত্রুকে ঠেকাইবার একমাত্র পথ নহে, শ্রেষ্ঠ পথও নহে—অতি নীচুদরের পথ। সেই হেতু অপমানের প্রতিশোধ কল্পে কায়িক শক্তি প্রয়োগ ও চর্চ্চার কল্পনায় আমার পীড়া অনুভব হয়, হয়, উহা একটা শ্রেষ্ঠ শক্তির অপ-প্রয়োগ। লাঠির মারে কোনও

অপমানেরই চরম প্রতিকার হয় না, কোন অন্যায়েরই শেষ মীমাংসা হয় না। আজ লাঠির ও ছোরার জোর যাহার বেশী সে জয়ী, কাল লাঠি ও ছোরা বা আগ্নেয়াস্ত্রের জোর যাহার অধিক হইবে সেই আবার প্রথমকে পরাভূত করিবে। ইহাতে ন্যায়ের বা সত্যের জয় নাই—অন্যায়ের প্রতিকার নাই—আছে স্বাভাবিক পশুবৃত্তির বিকাশ। মুসলমানেরা যদি হিন্দুর মাথায় লাঠি মারে, তবে হিন্দুরাও পাল্টা মারিতে পারে। কিন্তু তাহাতে বিবাদের মীমাংসা হয় না। উভয় পক্ষের শক্তি-চর্চ্চা ও প্রয়োগ বর্দ্ধিত হইতেই থাকে।

পশু-শক্তি সঞ্চিত হইয়া উঠিলেই অসংযত মনোবৃত্তি তাহার প্রয়োগের অবকাশ খোঁজে। আজ মুসলমান এক ঘা মারিলে হিন্দু যদি তুই ঘা বসাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হয় ও দেয়, তবে তারপর দিন মুসলমানই বা দশ ঘা দিবার জন্য প্রস্তুত হইবে না কেন ও দিবে না কেন? বস্তুতঃ হইতেছেও তাহাই। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ ও অধিকতর বলশালীর জয় আরো অধিক বল-প্রয়োগে প্রোরোচিত করিতেছে। ইহার শেষ কোথায়? শেষ কি তাহা মহাভারতকার অপূর্ব্বশক্তির স্তুতির ভিতর দিয়া অপূর্ব্ব ধ্বংসে দেখাইয়াছেন। উভয় পক্ষই মৃত, নষ্ট, উৎসন্ন হইয়াছে, নারায়ণী সেনা ও সমগ্র যদুকুলকে একই সর্ব্বনাশে গ্রাস করিয়াছে। শক্তির আসুরিক প্রয়োগের ইহাই পরিণতি। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধও এই শিক্ষাই দিয়াছে।

যদি এমনি হয়, তবে লাঠি ও ছোরা খেলার আবশ্যকতা কি—উহার ব্যবহারই বা কোথায়? পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাতে শরীর দৃঢ় হয়, ইহাতে ইন্দ্রিয় সকলের ও ইন্দ্রিয়াধিপ মনের জাগৃতির ও ক্রিয়াকুশলতার

অনুশীলন হয়। সঙ্গে সঙ্গে যদি অহিংসার সাধনা না থাকে তবে, ইহা হইতে অবাঞ্ছনীয় ফল প্রসূত হইবে। মনে রাখিতে হইবে সীতা দেবীকে তাঁহার অপরিসীম পবিত্রতাই রক্ষা করিয়াছিল—তিনি না ছোরা খেলা জানিতেন, না ছোরা ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্রতা মৃত্যুজয়ী। সে-পবিত্রতা মৃত্যু আনিতে পারে, কিন্তু সে-মৃত্যু অমরতা দেয়। সচকিত আগ্রহে আততায়ীর ছোরা ঠেকানো হয় ও পাল্টা আক্রমণ করা হয়। ছোরা ও লাঠি খেলার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সচকিত ও আগ্রহান্বিত করা ও দেহকে সহিষ্ণু করার শক্তি অর্জ্জন করা যায় এবং জাগ্রত ও বশীকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে হৃদয়স্থ রিপুগণকে আক্রমণ ও নাশ করিবার শিক্ষা ছোরা খেলা হইতে পাওয়া যায়।

এই দৃষ্টি যেখানে নাই সেখান হিংসার প্রশ্রয়ে আসুরিক বল ব্যবহৃত করার আশঙ্কা আছে। আপনা আপনির ভিতরে লাঠা-লাঠিতে ও হানা-হানিতে ইহার পরিণতি। বল-চর্চ্চার এই পরিণতিতে আজ জগৎ পীড়িত—একথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

জাতীয় পতাকা

নামে যেমন জাতি পরিচিত, তেমনি তাহার পাতাকার রূপ দ্বারাও তাহার পরিচয়। একটি বিশেষ রং বা চিত্রের সমন্বয়ে গঠিত পতাকা এক একটী বিশেষ জাতির পরিচায়ক। ভারতবর্ষের কোনও জাতীয় পতাকা ছিল না—আজ হইয়াছে। ভারতের জাতীয়তা-ব্যঞ্জক পতাকা আজকাল রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান সমূহে অধিক ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু জাতীয় পতাকা যখন ছিল না তখন কি ভারতীয় বলিয়া এক বিশেষ জাতি ছিল না? ইংরাজেরা এই শিখাইয়াছেন যে, ভারত একজাতি কখনও ছিল না, ইংরাজেরা আসিয়াই এই গঠন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু এই কৃতিত্ব ইংরাজদের নহে। তাহারা ভারতকে একজাতি গঠনে সহায়তা করেন নাই—ভারতকে নানা সূক্ষ্ম কৌশলে বিভক্ত করিয়াছেন। কেন না বিভক্ত ভারতেই বৈরাজ্য সম্ভব। ভারতে জাতীয় পতাকা না থাকিলেও জাতীয় ঐক্য-বোধ ছিল। ভারতের চিন্তায়, আচরণে, কর্ম্মে, বচনে ভারতের বিশাল ঐক্য প্রকাশ হইত। পতাকার মতন একটা চোখে দেখার মত জিনিষ অবলম্বন না করিলেও ভারতের আরও উচ্চতর কিছু অবলম্বন করিয়া এই জাতীয়তা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ জল-শুদ্ধির মন্ত্র ও ভারতীয় তীর্থগুলির বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। "গঙ্গেচ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী জলেস্মিন সন্নিধিং কুরু।" গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী নদীর জল এই (পূজায় ব্যবহার্য্য) জলের সহিত

এক হউক। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নদীর জল দেবার্চ্চনার জন্য রক্ষিত জলের সহিত এক হওয়ার মানে—ঐ ঐ জনপদের লোকের সহিত মন্ত্রোচ্চারক নিজেকে যে এক বোধ করেন, তাহারই অনুকূল ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। ঈশ্বরকে স্মরণকালে এই কথা যেন ভুল না হয় যে, ভারতবর্ষীয়গণ যে প্রদেশেই থাকুন না কেন—সকলেই এক। ভারতবর্ষের তীর্থ স্থানগুলির পরিকল্পনার পশ্চাতেও এই বোধ রহিয়াছে। পূর্ব্বীয়গণ জানিতেন যে ভগবৎ আরাধনা গৃহ-কোণেও করা যায়, তজ্জন্য তীর্থান্বেষণের আবশ্যক নাই। এই তীর্থগুলি জাতীয় ঐক্য সংগঠনের জন্য পরিকল্পিত। এই সকল তীর্থ স্থানে বিভিন্ন জনপদের প্রধানগণ একত্র হইয়া পরস্পরের ভাব বিনিময় করিতেন এবং সেই সূত্রে জন-সাধারণও একে অন্যের সহিত যোগযুক্ত হইত। প্রশ্ন করিতে পারা যায় যে, হিন্দু-ভারতে এই জাতীয়তা বোধ বর্ত্তমান থাকিলেও মুসলমানদিগকে লইয়া ভারতবর্ষ কি এক জাতি গড়িয়া উঠিয়াছিল? না—তাহা হয় নাই। তাহার হেতু জাতি গঠনে সময় লাগে। মুসলমান আক্রমণ যখন অকস্মাৎ ভারতের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল এবং তারপর মুসলমানগণ যখন সম্রাট হইয়াছিলেন তখন ভারতবর্ষ বড় একটা ঝাঁকুনি খাইয়াছিল। উহা হইতে স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে সময় লাগে। আকবরের সময় হইতে এই কার্য্য সংসাধিত হওয়ার পথ খুলিয়াছিল। কিন্তু ইংরাজ অভ্যুদয়ের সাথে সাথেই ইহাতে বিষম বিঘ্ন ঘটে। আর কিছু দিন পরে ইংরাজ আক্রমণ হইলে হয় ত আজ যেমন বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী পরস্পরের মৈত্রি-ভাজন হইয়া হিন্দুদের সহিত বসবাস করিতেছে, মুসলমান সম্বন্ধেও তাহাই হইত। কিন্তু বৈরাজ্য প্রতিষ্ঠিত

হওয়ায় আর তাহা সম্ভব হয় নাই। তাহার পর হইতে স্বাভাবিক সহনশীলতা ও প্রতিবেশীর প্রীতি বন্ধনে বিঘ্নই ঘটিয়া আসিতেছে। হিন্দু ও মুসলমানে যে অনৈক্য আজ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা অস্বাভাবিক। সেই হেতু ভারতের স্বাধীনতা বোধ ছিল না, ইংরাজেরাই ইহা গড়িয়া তুলিয়াছে ইহা বলিলে ভুল হইবে। গভীর জাতীয়তা বোধ ছিল ও তাহা নানা ভাবেই প্রকাশিত হইত।

আজ জাতীয়তা ব্যক্ত করার জন্য ত্রিবর্ণ-পতাকা ব্যবহৃত হইতেছে। যে কোনও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইয়া থাকে। জাতীয় পতাকা ভারতের বিশেষত্ব-ব্যঞ্জক। যেখানে জাতীয় পতাকা সেই স্থানেই ভারতবর্ষের বিশেষ জাতীয় ভাব বিরাজমান আছে—ইহাই সূচিত হয়। গৈরিক বসন যেমন ব্রহ্মচর্য্য সূচনা করে, ভারতের জাতীয় পতাকা তেমনি ভারতের বিশেষ ধর্ম্মবোধ যাহার উপর ভারতীয়তা প্রতিষ্ঠিত তাহাই সূচনা করে। একথা আমাদের যেন বিশেষ করিয়াই স্মরণ থাকে যে, জাতীয় পতাকা কেবল পতাকা মাত্র নহে, তাহার পশ্চাতে ভারতের উদারতা—ভারতের বিশেষ ধর্ম্ম-বোধ বর্ত্তমান। জাতীয় পতাকার সম্মান রাখার অর্থ—যে-সমস্ত গুণ ভারতের বৈশিষ্ট্য সেই সকল গুণের সম্মান করা। যিনি ভারতের বিশেষ ধর্ম্মভাব পোষণ করেন, যাঁহারা ধর্ম্মে সহিষ্ণু ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখেন তাঁহারাই ভারতের জাতীয় পতাকার বাহক। ঈশ্বর আমাদিগকে ভারতের জাতীয় পতাকা বহনের শক্তি দান করুন।
